কান্নার প্রহর

কান্নার প্রহর

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

কথামালা প্রকাশনী
১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

কালো মেয়েদের হাতে

আশ্চর্য, হঠাৎ আবিষ্কার করল সীতা, ও কালো। কালোই শুধু নয়, কুৎসিতও। এ আবিষ্কার নয়, নতুন করেই খোঁজা নিজেকে, নতুন করেই জানা। ও যে কালো জানতো সীতা, জানতো ও কুৎসিতও। তবু এতোদিনের পৃথিবীর অসংখ্য জানার মতো, ও যে কালো মেয়ে, এ জানাটাও অসংখ্য জানার ভিড়ে ভিড় বাড়িয়েই ছিল শুধু। কোনোদিন কখনো তো জানার ভিড় থেকে ও আলাদা মাথা তুলে দাঁড়ায়নি, দাঁড়াবার স্পর্দ্ধা দেখায়নি। তবু এ তো সত্যি, কেউ না জানুক তবু এ সত্যি। কেউ না বলুক এ সত্যি। ও কালো। রূপের আলো নিয়ে আসেনি সীতা পৃথিবীতে। আসেনি তো রূপের প্রভায় পৃথিবার কাউকে ভালো লাগাতে। তবু পৃথিবীর এতো অসংখ্য সত্যির মাঝে কোনো মিথ্যে কি বাঁচে না?

জানালার কাছে এগিয়ে এলো সীতা। বাইরে কালো অন্ধকার। ওর কালো রূপেরই মতো কালো কি? পেছনে ফেলে-আসা অগুণতি রাতের অনেক রাত এই জানালার কাছে দাঁড়িয়েছে সীতা। এখানে দাঁড়িয়ে অনেক দেখেছে অন্ধকার রাত। কিন্তু রাতকে এতো কালো এর আগে কোনোদিন কখনো তো মনে হয়নি। নিজেকে কালো বলে হঠাৎ খুঁজে পাওয়ার আবিষ্কারের খুশীতে কি? খুশীই হয়ত। তবু তো চোখে ওর টলটল করছে জল। এ-কান্নায় খুশীরই পান্না চিকচিক্ করছে কি? কে জানে। নোনা জল শুধু কান্নার দুঃখেই তো ঝরে না, আনন্দেও তো ঝরে। এ-কান্নায় খুশীর কোন্ পান্না, কেইবা খুঁজে বার করবে? কেইবা বলবে, কান্না তো নয়, এ যে মুক্তো রে। এমনি আবেগে, এমনি আদরে, সহানুভূতির স্নিগ্ধ পরশে পৃথিবীর চেনাদের মধ্যে হয়ত দু'জনই এসে বলতে পারত। বন্যা আর ইন্দ্রজিত। বন্যা একগাদা কথা বলে আর একরাশ হাসে। এ দুটোর কিছুই করে না ইন্দ্রজিত। চুপ করে বসিয়ে কবিতা শোনায় খালি। দু'জনের মধ্যে ব্যবধান তো অনেক। তবু

হু'জনকেই ভালো লাগে সীতার। একজন কান্নার প্রহর গোণে। আর একজন প্রহরে প্রহরে হাসির পান্না ঝরায়। ওরা সত্যিই ভালোবাসে সীতাকে। ভালো না বাসলে কোনো কালো-কুৎসিত মেয়েকে এতো ভালো কথা কেউ কি বলতে পারে ?

জানালার বাইরে কালো পৃথিবী অন্ধকার। অন্ধকার সমস্ত আকাশটাই। অন্যদিন চাঁদ উঠতো। ছোটো বড়, ভাঙা চোরা। আজ কোথাও নেই চাঁদের ফোঁটা। অন্তহীন কালো আকাশে অসংখ্য তারার মিটিমিটিই শুধু। চাঁদ-না-পাওয়া কত আকাশ দেখেছে সীতা, চাঁদ পাওয়াও কত আকাশ দেখেছে সীতা—কিন্তু এমনি করে রাতের আকাশে চাঁদকে কোনোদিন খোঁজেনি তো। আজ থেকে কি ওর নতুন করে শুরু হ'ল চাঁদ খোঁজার রাত ?

পাশের ঘরে আলো জ্বলল। গীতা ফিরল বেড়িয়ে। সেণ্টের মিষ্টি গন্ধ ও-ঘর থেকে ঝিরঝিরিয়ে এ-ঘরেও ঝরে পড়ল হাওয়ায় ভেসে। ভারি ষ্টাইলিষ্ট হয়েছে মেয়েটা। এবার পড়তে বসবে। সামনেই ওর ম্যাট্রিক পরীক্ষা। পাশ করবে বলে তো মনে হয় না। রাতদিন হৈ-হল্লা আর আড্ডা। কতক্ষণই বা পড়ে। এতো কথা বলতে পারে মেয়েটা। এক ঘণ্টা বই হাতে নিয়েই অন্তত হাই তুলবে একশোবার। তারপর নিচে নেমে যাবে রান্না ঘরে। মা ভাত দাও, কুইক। ভাত খাবার পর আর কি পড়াতে মন বসে ? নীল হুটো চোখে ঘুমের দেশের লোভী পরীরা চুমু দিতে লাগল। টেবিলে বই ছড়ানো, ঘুমে জড়িয়ে আসে চোখ হুটো। তারপর এক সময় খুব তাড়াতাড়িই একরাশ কোঁকড়ানো কালো চুলে ভরা ছোট মাথাটা চেয়ারে এলিয়ে পড়বে।

কতদিন ওকে ঠেলে উঠিয়েছে সীতা। এই ওঠ। হতভাগা মেয়ে, এই তোর পরীক্ষার পড়া হচ্ছে বুঝি ?

ধড়মড় ক'রে উঠে পড়ে গীতা। কি করবো রে, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে যে।

যত ঘুম, সব তোর এই পড়ার সময়ই বুঝি ?

হেসে ফেলল গীতা। ভারি মিষ্টি হাসে মেয়েটা। কি করব, ঘুম পায় যে।

কিচ্ছু করতে হবে না। ঘুম ভাগাও। সীতা উপদেশ দেয়।

তার চেয়ে তুই পড়াটা করে দে না মেজদি, প্লিজ। তোর তো ঘুম আসে না।

তা হ'লে পরীক্ষার হলেও তোর ঘুমই আসবে। পেনসিল, কলমের জায়গায় রোজ বিছানা নিয়েই তা হ'লে পরীক্ষা দিতে যাস।

অন্য কোনো মেয়ে হ'লে গম্ভীর হয়ে আবার পড়ায় মন দিত। ও কিন্তু হেসেই ফেলল। রাতদিন খালি হাসেই মেয়েটা। এতো হাসি যে কোত্থেকে পায় ও, এক এক সময় ভেবে অবাকই লাগে সীতার।

মা বকাবকি করে, মুখপুড়ি মেয়ের খালি হাসি, খালি হাসি। ওই হাসিই একদিন কাল হবে মেয়েটার।

আহা বোকো না। বাবা বাধা দেয়। লেট হার লাফ। হাসতে আজকাল পৃথিবীতে ক'জনই বা পারে।

তোমার আদরেই তো মেয়েটা এমন হচ্ছে।

বাবা হাসে। জবাব দেয় না। জবাব কিই বা দেবে? জানে সীতা, বাবার জবাবই যে নেই। আদর দিয়ে বাবা গীতার মাথা খাচ্ছেই হয়তো। তবু এতো হাসি ভালো নয়। মাথামুণ্ডু নেই, এত কিসের হাসি রাতদিন মেয়েটার? মাঝে মাঝে রাগই হয় সীতার। ভাবে, খুব বকে দেবে। কিন্তু আশ্চর্য, বকতেই পারে না। শুধু ওকে নয়, বকতে কাউকেই কি পারে সীতা? ওর নিজের কাছে দুঃখ অসীম, তাই হয়ত কাউকে ও দুঃখ দিতে পারে না। তাই কি? আর দুঃখ কাউকে ও দিতে পারে না বলেই সে কি সবার কাছ থেকে দুঃখ পাবে? তাই কি সহজে স্বচ্ছন্দে সুরজিত বলে গেল, তোমাকে নিয়ে আনন্দ করা যায়, ভালবাসা যায় না। তাই কি বলে গেল, তুমি কালো, কুৎসিত। দুঃখ দিতে সীতা পারে না বলেই কি দুঃখ দিয়ে গেল সুরজিত? এতোদিনের আলো-আবির হাসিখুশী হারিয়ে গেল কি সুরজিতের বিমর্ষ বিষণ্ণ আবিষ্কারের কান্নার কালো একটা কৌটায়?

নিচে রান্নাঘরে কড়া চাপানোর সঙ্গে গন্ধ আসছে তেলের। গীতা নিশ্চয়ই সাহায্য করছে মাকে। কুণাল সিনেমা গেছে।

ধরেছিল ওকে। যাবি দিদি, চল না, গ্র্যাণ্ড ছবি রে। গ্রেগ্‌রি পেক্‌ যা পার্ট করেছে, মারভেলাস্‌। 'রাজী হয়নি সীতা। ওর ওসব সিনেমা-টিনেমা ভাল লাগে না। আর ঠিক তেমনিই হয়েছে কুণালটা, সিনেমার পোকা। সব নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীরই নাড়ীনক্ষত্র ওর মুখস্থ। তা সে এদেশেরই হোক, কি সাগর পারেরই হোক। কি ক'রে যে মনে রাখে কুণালটা।

বাবার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। বাবা নিশ্চয়ই খবরের কাগজ ছড়িয়ে বসেছে। কাগজ পুরো শেষ করতে বাবার একটা ঘণ্টা লাগে। একটা ঘণ্টা নেবার মত কি যে এতো মাথামুণ্ডু আছে কে জানে। ওতো ভেবেই পায় না। তবে সীতা জানে ওই পাত্রপাত্রীর পাতাটায় বাবা অনেকক্ষণ সময় কাটায়। ঠিকানা খুঁজে চিঠিও লেখে। জবাব কটারই বা আসে! যেটার বা আসে, দুটো চিঠি আসা-যাওয়ার পরেই তা থেমে যায়। বাবা কি আশ্চর্য বোকা, এ কি জানে না, এদেশে কালো মেয়ের কি বিয়ে হয়? কেন যে চিঠি লিখে লিখে ভাবনা বাড়ায় ইচ্ছে ক'রে!

মিষ্টি সেণ্টের গন্ধ অনেক কাছে ছড়িয়ে এলো। ওকে দেখা না গেলেও ওর সেণ্টের গন্ধ জানিয়ে দিল গীতা এসেছে।

ওমা, তুই এ-ঘরে আছিস নাকি রে মেজদি? তোর ঘব অন্ধকার দেখে ভাবলুম তুই নেই বুঝি। ঘর অন্ধকার করেছিস কেন?

এমনিই।

তোর সব কাণ্ডই বিদঘুটে। জানালার দিকে এগিয়ে এলো গীতা, আবছা অন্ধকারে। এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস শুনি?

আকাশ দেখছি।

কি যে আজ আকাশে আছে। চাঁদ থাকলেই তো আকাশ দেখবার রে!

তোর চাঁদের আমার দরকার নেই। আমি কালো, কালো আকাশই আমার ভাল।

ওমা রাগ বুঝি? তা আগে বলতে হয়। ওকে দু'হাতে আদরে জড়িয়ে ধরলো গীতা। তুই কেন কালো হবি রে? তুইতো মেজদি কৃষ্ণকলি।

যা সর, ওস্তাদি মারতে হবে না। পড়তে যা দিকি।

যাবনা। পড়বও না।

বেশ হবে। ফেল করবি।

করবো।

ফেল হলে আরো দুটো হাত বেরবে বুঝি?

বেরবেই তো। তখন চার হাতে তোকে জড়িয়ে ধরব।

হেসে ফেলল সীতা, ও হাসাবেই। কোথেকে যে ও হাসির এই অফুরন্ত সম্পদ পেয়েছে কে জানে।

কোথায় এতক্ষণ আড্ডা মারছিলি শুনি?

বারে, আড্ডা আবার কোথায়। সুনন্দাদের ওখানে হাইজিনের নোট টুকছিলাম।

ঠিক কথা?

একেবারে ঠিক।

ওর দাদার সঙ্গে গল্প মারছিলি নাতো?

তা একটু-আধটু গল্প করতে কি হয়েছে, নোটতো ঠিক টুকছিলাম। জানিস মেজদি, ওর দাদা এন, সি, সি ক্যাম্প থেকে ফিরেছে। ও, কি মজার-মজার গল্প করছিল সব, তোকে কি বলব! এই মেজদি, কলেজে ঢুকে আমিও এন, সি, সিতে ভর্তি হব কিন্তু।

তা হোয়ো। কিন্তু ম্যাট্রিকটা আগে পাশ করতো। যা তোর পড়াশুনোর নমুনা দেখছি। যা, শিগ্‌গির বই নিয়ে বস।

খুব ভালো লাগে গীতাকে ওর। এতো যে হাসে রাতদিন কারণে-অকারণে, তাকে ভাল না লেগে পারেকি? ভালো লেগেছিল সুরজিতকেও সীতার। ভালো তো লেগেছে সকলকেই। পেছনে ছড়িয়ে আসা অনেকগুলো দিনের প্রতিটি প্রহর, প্রত্যেকটি মুহূর্তকে। ভাল লাগার অসংখ্য ফোঁটা শিশিরের মত চারদিকে আনাচে-কানাচে চিক্‌চিক্ করছে।

দুই বোন যেতো স্কুলে। বব্‌ করা চুলে লাল রিবন। সীতা আর ওর বড় বোন ইতা। দুটো লাল রিবন কালো চুলের ঝাঁকে চিক্‌চিক্ করতো। সাধু চাকর সঙ্গে যেতো। গাড়ী-ঘোড়া সামলে

রাস্তার এক কোণ দিয়ে যাবি হু'বোনে। সাধু চাকর সঙ্গে, তবুও মার ভয়। ভাবে সীতা, মা হওয়ার কি জ্বালা।

তুই দিদির হাত ধরে যাবি, বুঝলি ?

বাবা বলতো। বুঝতো কিনা কে জানে, তবে মাথা নাড়তো সীতা। কিন্তু দিদির হাত ধরে রাস্তা হাঁটতে একটুও ভাল লাগত না।

এই, হাত ধরনা।

না। মাথা দোলালেই বব চুলের কয়েকটা ঝাঁক সীতার কপালে পড়ত এসে।

দাঁড়া। বাবাকে বলে দোব।

আর বলে দিতও। জানো বাবা, টুনু আজ আমার হাত ধরেনি।

হাত ধরেনি ? হোয়াই নট্ ? এদিকে এসোতো টুনুরানী, কানটা তোমার মুলে দিই।

তখন ভারি ভালো লাগতো। ভারি ভালো লাগতো বাবার মুখে ওই টুনুরানী নাম শুনতে। আজকাল ও-নামে তো আর ডাকে না বাবা। কতদিনই ডাকেনি। কেন, কে জানে। হয়ত ও-নাম ভুলেই গেছে বাবা। হয়ত ইচ্ছে করেই ডাকেনা।

টুনুরানী কিন্তু সামনে আসতো না। এক দৌড়ে পালিয়ে যেতো। কোথায় ? মিনুমাসীব বাড়ী। কি চমৎকার দেখতে ছিল মিনুমাসীকে। এখনও আবছা মনে পড়ে সীতার, আর সবচেয়ে মজা ছিল, মিনুমাসীর বাড়ীতে না ছিল বারণ, না ছিল বকুনি। আর সব চেয়ে আকর্ষণ, মিনুমাসীব বাড়ীতে ছিল এক গাদা কুল আর পেয়ারার গাছ।

কে কাসছে রে ? রাত্তিরে মা চেঁচাতো।

ইতা ঠিক বলে দিত, টুনু মা !

কতবার বলেছি, কাঁচা কুলগুলো খাসনে। তা কি হতভাগা মেয়ে কানে শুনবে ? এবার কাশলে দোব ঘর থেকে বার ক'রে।

ভারি ভালো লাগতো মিনুমাসীকে সীতার। কি টক্‌টকে গায়ের রং, আর কত বড় বড় ছিল মাথার এক গাদা কালো চুল। কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগতো মিনুমাসীর বাড়ীর কুল আর পেয়ারার

গাছগুলো। বড়দা ওর একপাল বন্ধু নিয়ে গাছে উঠতো। বেশ মজা ছিল ওদের। গাছে বসে বসেই পেয়ারা চিবোতো।

এই বড়দা, দে নারে একটা। ফেলনা নিচে।

ভারি পাজি ওরা। নিচে ফেলবার নাম নেই। নিজেরা দিব্যি গাছে বসে বসে খেতো। খুবই রাগ হ'ত ওদের ওপর। ও-যদি গাছে উঠতে পারত। একদিন সাহস ক'রে উঠেওছিল। দেখতে পেয়ে সেই একদিনই বকেছিল মিনুমাসী। তবু ওকে কি বকা বলা যায়? ও-বকার মধ্যে আদরই ছিল তো বেশী। বলেছিল মিনুমাসী, দুষ্টু মেয়ে! নেমে আয় শিগ্‌গির! প'ড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙলে আর বিয়ে হবে না। তাড়াতাড়ি নেমে এসেছিল সীতা, হাত-পা ভাঙার চেয়ে, বিয়ে না হবার ভয়েতেই বেশী। বিয়ে কি, কাকে বলে, কেমন করেই বা হয়, কিছুই তো সেদিন জানতো না সীতা। তবু বিয়ের কথা শুনলে কেন কে জানে, আশ্চর্য, ভালোই লাগত তখন। মনে হ'ত বিয়ে হওয়া ভারি এক মজার ব্যাপার। ঘুম পাড়াতে পাড়াতে ঠাকুমাও সুর করে গান গাইত, টুনুরানীর বর আসবে পক্ষীরাজে চড়ে। টুনুরানী জানতো বৈকি বিয়ে বরের সঙ্গেই হয়, আর জেনেছিল পক্ষীরাজ ঘোড়া আকাশ থেকে পাখা মেলে নেমে আসে। সেদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে কত রাত তারার মিটিমিটিতে ছড়ানো আকাশের দিকে তাকিয়ে ও পক্ষীরাজ ঘোড়াই খুঁজে বেড়িয়েছে।

অনেকদিনের পর সেই জানালারই পাশে দাঁড়িয়ে সীতা পক্ষীরাজ ঘোড়ার পদধ্বনি আর শুনল না, শুনল কান্নারই প্রহর। সেদিনের বিয়ের স্বপ্নে কে জানতো একটুও মজা নেই, নেই একটুও খুশীর সানাই, আছে শুধু বিষণ্ণ সুরেরই আলাপ। সেদিনের পক্ষীরাজ ঘোড়ায়-চড়া, টোপর-পরা বর কি কোনোদিনই সত্যি ছিল না? ঘুম পাড়ানি ছড়াতেই কি কবির কল্পনা হয়ে ঘুরে বেড়াতো? সুরজিতের কাছে পাখাওয়ালা পক্ষীরাজ ঘোড়া ছিল না, মাথায় ছিল না সোনার টোপর, ছিল না কপালে চন্দনের ফোঁটা। তবুও তো ওকে ভাল লাগলো সীতার। কেন, কে জানে। হঠাৎ কাউকে ভাল লাগার মানে হয়ত নেই। একদিন বিছানায় শুয়ে তারায়-ভরা আকাশের

দিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ ও যেন কানে পক্ষীরাজ ঘোড়ার পায়ের শব্দ পেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছিল সীতা, আশ্চর্য সেই রাতে। কিন্তু মনের খুশীর আবির দেহেতেও রং লাগায় কি? নইলে হঠাৎ ও ধরা পড়ল কি করে বৌদির কাছে?

আজকাল তোমার কি হয়েছে গো?

কি আবার! এড়িয়েই গেল সীতা।

কিন্তু বৌদির কাছে এড়ানো শক্তই। উঁহু, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। আজকাল তোমায় খুব হাসিখুশী দেখাচ্ছে।

তাতে কি? মজা পেয়েই যেন ঠোঁট চাপল সীতা দাঁত দিয়ে।

তাতেই তো সব। এই বয়েসে এতো হাসিখুশী মানে নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে।

একটা কিছু কি?

আহা, জানেন না যেন। ন্যাকা মেয়ে। এই বয়েসে সব মেয়েরই যা হয়ে থাকে। মুখটা কানের খুব কাছে আনল বৌদি। ভালবাসা, নাগো?

ধরা পড়ে গেছে সীতা। কি করে ধরে ফেলল কে জানে। না বলতে পারল না সীতা। না বলতে চাইল না।

কি ক'রে জানলে?

হাসল বৌদি, জানি গো জানি।

তুমিও নিশ্চয়ই বিয়ের আগে কাউকে ভালবেসেছিলে।

ছিলামই তো।

দাঁড়াও, দাদাকে বলে দিচ্ছি।

দিও। খিলখিল ক'রে হেসে উঠল বৌদি।

আচ্ছা বৌদি, ঘুরে দাঁড়াল সীতা, তুমি জানতে পারলে কি করে?

এতে জানাজানির কি আছে। এসব হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স। ইয়ং গার্ল, মুখ দেখলেই আমরা বুঝতে পারি। বয়েস বাড়ুক, তুমিও পারবে।

আহা, কি আমার বুড়ী ঠাকুমা এসেছেন রে!

ধরে ফেলেছিল বৌদি। ফেলুক, কাউকে ভালবেসে ধরা পড়তেই তো ভালো লাগে। ভালবেসেছিল সুরজিতকে সীতা।

ভালবেসেছে তো পেছনে ছড়ানো দুরন্ত খুশীর দিনগুলোয় অনেককেই —কই, ওরা কেউতো বলেনি তোমার এ ভাললাগা অপরাধ। কেউতো বলেনি তোমার এ ভাললাগা অন্যায় ?

মিনুমাসীর সেই পেয়ারা আর কুল গাছগুলোর নিচে রাতদিন যত রাজ্যের বাচ্চাদের ভিড় তো লেগেই থাকতো। ওদের মধ্যে আশ্চর্য, এক ফুটফুটে মেয়েকে একদিন হঠাৎ ভালো লেগে গেল সীতার।

এই নাম কিরে তোর ?

মুনুসোনা। মিষ্টি মেয়ে ঘড়ে দোলাল।

আর আমার নাম জানিস ? টুনুরানী। সীতাও তো দমবার মেয়ে নয়।

মুনুসোনা আর টুনুরানীতে ভাব হয়ে গেল মিনুমাসীর পেয়ারা গাছের তলায় ডাঁসা পেয়ারা চিবোতে চিবোতে।

এই, কোন্ কেলাসে পড়িস রে তুই ? ঠেলা দিল টুনুরানী মুনুসোনাকে।

পড়িনা।

পড়িস না ? কিরে তুই ? আমি কোন ক্লাসে পড়ি জানিস ? ক্লাশ ওয়ান।

বাবা আমাকেও ওয়ানে ভর্তি ক'রে দেবে বলেছে।

ইতা আর সীতা দুই বোনের স্কুলে যাওয়ার সঙ্গী হ'ল আর একজন। মুনুসোনা। ভালো নাম বন্যা। বব চুলে বাঁধা দুটো লাল রিবনে যোগ হ'ল সবুজ রিবন।

ভালো লেগেছিল বন্যাকে। ওকেই কি শুধু ? ধানতুলী পার্কের সেই বুড়ো মালিটা। গোলাপ ফুল ছিঁড়লেই চোখ রাঙিয়ে ছুটে আসতো। কি বড বড় দুটো চোখই না ওর ছিল। গোলাপ ফুল চাইতে তবু রোজ বিকেলে একপাল ছেলেমেয়ের দল ওর চারপাশেই ভিড় করতো। ভাগো সব, ভাগো। সব কটা ছেলে-মেয়েদের ভাগিয়ে দিত বুড়ো মালি। পরে সীতাদের ছোট্ট দল একলা গেলে বুড়ো হেসে হেসে জিগ্যেস করত, হম্‌সে সাদি করোগি ছোকরি ? সাদি কথাটার মানে প্রথম প্রথম কেউই তো বুঝত না।

বুঝতো যখন, যে যার দৌড়ে পালিয়ে যেতো। বুড্‌ঢা সে সাদি নহি করুঙ্গী। নহি করুঙ্গী।

ধানতুলী পার্কের বুড়ো মালি কিন্তু চটত না একটুও। একপাল লম্বা কাঁচাপাকা দাড়ি নেড়ে নেড়ে বলতো হেসে হেসে, বুড্‌ঢা হু জরুর মগর খুপসুরৎ ভি হু। কেঁউ? একরাস ছোট ছেলে-মেয়েদের ভিড় খিলখিল ক'রে হেসে পালিয়ে যেতো। ওদের কেউ যা পারেনি, সাহস করে একদিন তাই করল সীতা। বলে ফেলল করুঙ্গী সাদী।

বহুৎ আচ্ছা, আচ্ছা। কাঁচাপাকা চুলে ভর্তি ময়লা মাথাটা খুশীতে অনেকক্ষণ নাড়তে লাগল বুড়ো মালি। তারপর মস্ত একটা লাল গোলাপ ওর হাতে দিয়ে বললে, বস্‌ হো গেয়ি তুমারা-হমারা সাদি। অতো বড লাল গোলাপ দেখে ছেলেমেয়ের দল তো অবাক। সব মেয়েব দলই ক্ষেপে উঠল বুড়ো মালিকে বিয়ে কববাব জন্যে। হম্‌ভি করুঙ্গী, হম্‌ভি করুঙ্গী সাদি। বুড়ো মালিতো হেসে খুন এবাব। এক্‌বার সাদি হো গয়ি না হমারা।

ধানতুলী পার্কের সেই বুড়ো মালিকে মনে পড়ে বৈকি। মস্ত একটা লাল গোলাপ দিয়ে ও বিয়ে করেছিল সীতাকে। ওই বয়েসে বিয়ের কথা কইতে, বিযের নাম শুনতে কেমন আশ্চর্য ভালো লাগতো। মনে হত, বিয়ে মানেই বুঝি ভাবী মজা। বুড়ো মালির সত্যিই হয়ত ভালো লেগেছিল সীতাকে। ওতো কোনোদিন বলেনি, তুম্‌ খুপসুবৎ নহি তো ছোকবি, তুম্‌ কালি হো। বলেনি তো। কেন কে জানে। বলতে চায়নি, না বলতে পারেনি? এইতো কয়েক বছর আগে আবার দেখা হয়েছিল একদিন মালির সঙ্গে হঠাৎ। তখন সীতা অনেক বড, আব মালিও তখন অনেক বুড়ো। হেসে জিগ্যেস করেছিল, অপ্‌না সাদি ইয়াদ হোয়ে না বেটি? কবে কোন্‌ এক ছোট্ট মেয়েকে ভালো লেগে মস্ত এক লাল গোলাপ দিয়েছিল, এখনও মনে বেখেছে মালি। কবে সেই ছোট্ট টুস্থরানীকে সাদি করেছিল। সে বিয়েতে মজাই ছিল শুধু, ছিল ছেলেমানুষী। সেই ছেলেমানুষির বিয়েই হয়ত ভালো। ওখানে কান্না নেই। ব্যর্থতা নেই। হারাবার বেদনা নেই।

তবু সেদিনের ছোট্ট টুনুরানী, সেদিনের সেই মন দেওয়া-নেওয়ার মজার খেলাতেই তো সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। মস্ত লাল গোলাপের লোভে বুড়ো মালিকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে মনের গোলাপের পাঁপড়ির রোজ রাতের একের পর এক আশ্চর্য ফোটাকে থামাতে তো পারেনি সীতা।

হয়ত অক্ষমতা, হয়ত আনন্দ।

বন্যা মুচকি হেসে বলল, তুই মরেছিস রে।

বারে, মরব কেন ?

যে ভালবাসে, সেই তো মরে।

মাঝে মাঝে এক একটা আশ্চর্য কথা বলে ফেলে বন্যা। ওর চেহারার মতই সুন্দর কথা। যে ভালবাসে সেইতো মরে। কিন্তু এতো মরা নয়, নতুন করে বাঁচা। কিন্তু হঠাৎ কখন ওর সুরজিতকে ভালো লেগে গেল, কে জানে। এমনি ভালো লাগা কোনো খবর না দিয়ে হঠাতই কি মনের আধ-ভেজানো দরজা ঠেলে হুড়মুড় ক'রে ভেতরে ঢোকে ?

মাঝে মাঝে সুন্দর কথা বলে বন্যা। কিন্তু সুন্দর কথা বলে সব সময়, ইন্দ্রজিতও। লম্বা-চওড়া চেহারা ইন্দ্রদার। একলা ঘরে ইন্দ্রদা থাকে। হোটেলে খায়। আত্মীয়-পরিজন কেউ আছে কিনা, কেউ জানেনা। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে ইন্দ্রজিত। যেখনেই যায়, সেখানেই ছড়িযে যায় খানিকক্ষণ খুশীর ঢেউ। একটুখানি হাসিতে চারদিক খুশীতে ভরিয়ে যায়। একটুখানি খুশীতে একরাশ উচ্ছসিত আবেগ ঝরিয়ে যায়।

মা প্রায়ই নেমন্তন্ন ক'রে, কাল এখানে খেয়ে যেও ইন্দ্র।

ও. কে। মাসিমা।

বাবাও নেমন্তন্ন করে, কাল ছুটি আছে, সকালে এসো তো, গল্প করা যাবে।

ও. কে। মেসোমশাই।

গীতা ও কুণালও আব্দার ধবে, খুব ভালো একটা বই এসেছে ইন্দ্রদা, নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।

ও. কে। নাম্বার ফোর এ্যাণ্ড ফাইভ।

যেখানেই যাক ছোট বড় সকলের কাছেই ইন্দ্রদার ওই দুটো কথা ও. কে। বাড়ীতে এলে ইন্দ্রদা সব আগে সীতারই খোঁজ করবে। হোয়ার ইস্ নাম্বার থ্রি ?

এইতো। ঘর থেকে হেসে বেরিয়ে আসে সীতা।

অনেকদিন তোকে দেখিনি।

বারে, এইতো পরশুই দেখলে।

দেখেছিলাম নাকি ? ও. কে।

একদিন কুণাল প্রশ্ন করেছিল, রাতদিনই তোমার ও. কে। কখনো অল রঙ্ হয় না বুঝি ইন্দ্রদা ?

হয় বৈকি। ভুল হলেও, ভুলকেও ও. কে বলে চালিয়ে দিই।

ভাল লেগেছিল ইন্দ্রদাকে। লম্বা-চওড়া হাসিতে ভরপুর ছেলেটা ছোট্ট ঘরে এক আশ্চর্য খুশীর প্রাণবন্ত পৃথিবী গড়ে তুলেছে। পৃথিবীর কোনো কিছুতেই ভাবনা চিন্তা নেই ইন্দ্রদার। সব কিছুকেই নির্বিকার হাসিতে ও. কে করে চলেছে।

ভাল লেগেছিল দীননাথ স্কুলের সেই মাস্টারমশাই তুলসীবাবুকেও। দেখা হলেই গাল দুটো টিপে জিগ্যেস করত, হাউ ডু ইউ ডু, প্রেটি গার্ল ? হোয়াট ইস্ ইয়োর নেম প্রেটি গার্ল ? খিল খিল ক'রে হেসে পালিয়ে যেতো সীতা। প্রেটি কথাটার মানে প্রথম প্রথম বুঝতে পারেনি। পরে বুঝতে পেরে খুশীই হয়েছিল। তা হ'লে সত্যিই সে সুন্দরী। মাস্টারমশাই তো মিথ্যে বলে না ভুল বলে না।

এতদিনের এতো ভালোলাগা আর এতো ভাল বলার বন্যাই কি ওকে সাহস দিল ভালবাসার ? সাহস। হাসিই পেল সীতার। কাউকে ভাল বলায়, কাউকে ভাল লাগায় কিন্তু সাহস নেই একটুও। সুরজিত ভাল বলেই তো ভালো লাগলো।

বন্যার সঙ্গে বিয়ে নিয়ে কত কথা হয়েছে কতদিন।

সত্যি, বিয়ে তুই করবি না ?

উঁহু। জবাব দিয়েছিল সীতা।

বিয়ে না ক'রে কি করবি ? যোগিনী হয়ে থাকবি সারা জীবন ?

হুঁ।

আমিও। হাসল বন্যা।

দূর, তুই পারবিনা।

কেন শুনি ?

যা তুই রাতদিন হাসিস আর বক্‌বক্‌ করিস।

যারা যত বেশী হাসে আর বক্‌বক্‌ ক'রে, তারাই তত বেশী গম্ভীর হতে পারে, তা জানিস ?

ওর কথাই সত্যি। ওর কথা হয়ত ঠিক। তবু ওদের দু'জনের কেউই তো যোগিনী হ'তে পারল না। ভালবাসলো দু'জনেই। ভালবাসা, ছোট্ট এই কথাটার মধ্যে আশ্চর্য যাদু রয়েছে। আগে বিশ্বাসই করত না সীতা। এখনও কি পুরো বিশ্বাস করতে পারে ? তাই তো অবাক লাগে মাঝে মাঝে এখনও।

মনে আছে, একদিন প্রশ্ন করেছিল ইন্দ্রজিতকে, আচ্ছা তুমি কখনো কাউকে ভালবেসেছিলে ইন্দ্রদা ?

না তো।

তবে তুমি কবি হ'লে কি করে ?

কাউকে ভালবাসতে পারলাম না বলেই হয়তো।

কাকে ভালবাসতে চেয়েছিলে ?

সকলকেই।

দূর, সকলকেই ভালবাসতে পারা যায়! হেসে উঠেছিল সীতা।

তাইতো কাউকেই ভালবাসতে পারলাম না কৃষ্ণকলি!

সকলকে ভালবাসার কথা শুনে ইন্দ্রজিতের ঘরে বসে হেসেছিল সীতা। সেই একদিনই শুধু। সেই একবারই, তারপর আর হাসেনি। তারপর একলা ঘরে ঘুম না-আসা রাতে ভেবে দেখেছে অনেকবার, সবাইকে ভালবাসার দুর্বার সাধনা অদ্ভুত প্রাণবন্যায় দীপ্ত দুরন্ত ইন্দ্রদাই করতে পারে।

ভালবাসতে গিয়ে সুরজিতের পাশে বসে ইন্দ্রদার ভালবাসার কথাই মনে পড়েছে কতবার। ওই কথাই ভেবেছে।

মাঝে মাঝে তুমি কি ভাবো বলতো ?

বারে, কি আবার। হাসল সীতা।

তবে মাঝে মাঝে এমন গম্ভীর হয়ে যাও কেন ?

ও তো আমার স্বভাব।

তোমার বন্ধু বন্যা কত হাসিখুশি, কত হৈ-হল্লা করে।

ওসব আমি পারি না। বলল সীতা। তারপর সুরজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, বলতো আমিও ওর মত হাসব, খুব কথা বলব?

না না, ওসব ক'রে দরকার নেই। ও তুমি পারবে না। যাকে যা মানায়।

যাকে যা মানায়। সত্যি কথাই বলেছিল সুরজিত। অনেক দরদ দিয়ে, অনেক ভালোবেসেই তো বলেছিল। আশ্চর্য, সেই ছেলেই কি ক'রে বলল, তুমি কুৎসিত? সীতা কালো, সীতা কুৎসিত একথা সত্যি যতই হোক, এতদিন হৃদয় দেবার পর এমন হৃদয়হীন কথা ও কেমন ক'রে বলতে পারল? এই ক'দিনের মন বিনিময় কি ছেলেবেলার সেই বুড়ো মালিকে বিয়ে করবার মতই শুধু ছেলেখেলাই ছিল?

রান্নাঘর থেকে গীতার গলা পাওয়া গেল, বড়দা, মেজদি, সেজদি, কুণাল, ভাত দেওয়া হয়েছে, চলে এসো।

ভাতের সামনে বসে সীতা বলল, মা, আমার ভাত কমিয়ে নাও তো, এতো খেতে পারব না।

এতো আবার কোথায়? ঠিক পারবি।

না না, আমার একটুও ক্ষিধে নেই।

যত ক্ষিধে সব তোর ভাত খাবার সময়েই উবে যায় নাকি রে? না খেয়ে খেয়েই তো এই চেহারা হয়েছে। পেট ভ'রে না খেলে গায়ে মাস লাগবে কি ক'রে?

গায়ে মাস লাগিয়ে কি হবে মা? যতই পেট ভরে খাই, গায়ের কালো রং ফর্সা হবে কি? ম্লান হাসলো সীতা।

কালো কালো করিসনে বলছি মেজদি। গীতা ধমকে উঠল। এক্ষুণি আমি ভাত ফেলে উঠে যাব।

বারে, কালোকে কালো বলব না?

না। বাহাদুরি করতে হবে না।

বন্যাও রেগে উঠত কালো বললে নিজেকে ওর কাছে। কালো কালো করলে তোর সঙ্গে আর কোনোদিন কথা বলব না বলছি। জানতো সীতা, কথা ও বন্ধ করতে পারবে না। যে মেয়ে রাতদিন অসংখ্য কথায় অন্তহীন খুশী ভরিয়ে রাখে, সে কি বোবা হয়ে থাকতে পারে? তবু এতদিন নিজেকে কালো বলা আর এই আজকের কথা বলায় তফাৎ অনেক। আজ ও আবিষ্কার করেছে, ও সত্যি কালো, সত্যি কুৎসিত। এতদিনের কালো বলায় ক্ষোভ ছিল, কান্না ছিল না। এই কালোকে কান্নাতেই ভরিয়ে দিল সুরজিত। যে কালো ভালবাসতে দেয় না, মন দিতে দেয়, নিতে দেয় না।

ইন্দ্রদা বলে, কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।' ইন্দ্রদা বলতো, 'কালো, তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।' কত আবেগ আর আদর দিয়ে কথা যে বলে ইন্দ্রদা। ওর নাম তো ইন্দ্রদাই রেখেছিল, কৃষ্ণকলি। কালো মেয়েকে কৃষ্ণকলির মত এমন সুন্দর নামে সাজাতে কেইবা পারে।

বাবা বলতো, ওহে ইন্দ্র, তোমার সন্ধানে পাত্র-টাত্র আছে নাকি হে?

কার জন্যে মেসোমশাই?

কার জন্যে আবার, সীতার জন্যে। ওর জন্যেই ভাবনা হয় হে। রং তো তেমন ফর্সা নয়। আর কি জানো, মেয়ে আমার বড্ড অভিমানী।

হো হো ক'রে হেসে উঠতো ইন্দ্রদা। কৃষ্ণকলির আবার বিয়ের ভাবনা মেসোমশাই। জানেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ওকে ভালবেসে গেছেন।

ইন্দ্রদার কথা শুনে হাসিই পেতো সীতার। এ জবাবের কি কোনো মাথামুণ্ডু আছে? এমন কথা শুনলে কার না হাসি পায়। তবু ভালো লাগতো ওর এলোমেলো কথাগুলো। ওর আজেবাজে কথায় সব সময়ই তো ঝরত মমতা আর দরদ।

বলত ইন্দ্রদা, কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ।

সীতা হাসল, আমার তো কালো হরিণ চোখ নয়, ইন্দ্রদা।

কে বললে ?

বারে, আমার চোখ আমি জানি না !

ঘোড়ার ডিম জানিস। তোদের কি আর জানবার চোখ আছে, তোদের খালি খোঁজবার চোখ।

খোঁজবার চোখই বটে ! ধরে ফেলে ইন্দ্রদা। কালো হরিণ চোখে নতুন কোনো খুশীর ছায়া পড়েছে নাকি ?

কুণাল বলে উঠল, আমি বলবো কার কালো হরিণ চোখ।

কার রে ?

মেরিলিন মনরোর।

সে আবার কে ?

হায় হায়, হোয়াট্ এ পিটি। টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরিতে জন্মেও তুমি মেরিলিন মনরোর নাম শোনোনি ? খবরদার আর কাউকে বোলোনা দিদি।

সীতা ধমক দিল, তুই থামতো, ফাজিল ছেলে কোথাকার !

বলতে পারতো বন্যা, তুই কালো, তুই কুৎসিত। বলতে পারতো। ওতো কত সুন্দরী, ওর গায়ের রং কত ফর্সা। রঙের কোথাও তো মিল নেই দুজনের, তবু মনের আশ্চর্য মিল হয়ে গেল। কি ক'রে হ'ল ভাবতে অবাকই লাগে সীতার। যেমন অবাক লাগতো বাইরের সবারই। একটুও তো দেখতে সুন্দর নয় সীতা, তবু অসুন্দরের কান্নাকে খুশীর শিশিরে ভরাবার দুঃসহ ব্রত নিল ও কেন ? কোন আশায়, কি আশ্বাসে ? কোন মমতায় নিল বন্যা ?

ওর ঘরে, ওর বিছানায় দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে কতদিন ওর হাতে হাত নিয়ে বলেছে সীতা।

ইস, তুই কত ফর্সা রে !

ফর্সা ফর্সা করবি তো দোব গালে এক চড়।

বারে, ফর্সাই তো তুই।

বেশ, তোর তাতে কি। রেগে যায় বন্যা। তারপর আবার আবেগ এনে বলে, রং নিয়ে কি হবে রে, মেয়েমানুষের মনটাই তো সব।

দূর। তাতে কি ?

হ্যাঁ রে ঠিক তাই।

সেই মন নিয়েই তো ভালবাসলো সীতা। গায়ের রং ছিল কালো, চেহারা ছিল কুৎসিত, কিন্তু ও-মনের কোথাও ছিল না কালো দাগ। তবু ও-মনকে কান্নাতেই তো ভরিয়ে দিল সুরজিত। কান্নারও রং কি কালো ?

দেখা হতো রোজই বন্যার সঙ্গে। দেখা হলেই ধরত, সুরজিতের গল্প বল।

দুর, রোজ রোজ অতো গল্প কিসের।

আজ দেখা হয়নি ?

হু।

কথা হয়নি ?

হু।

তবে ?

তবে কি ? সব কথা তোকে বলতে হবে নাকি ?

হবেই তো।

তাহ'লে তুই আগে অমলেন্দুর গল্প বল।

না, তুই আগে।

আগে কে বলবে, তাই নিয়ে ঝগড়া হ'ত কিছুক্ষণ। তারপর মিটমাট হ'ত রোজই। কোনোদিন ও আগে, এ পরে। কোনোদিন ও পরে, এ আগে। এ শুনত, ও শোনাত ; ও শুনত, এ শোনাত।

দু'জনের শোনবার শোনাবার গল্প তো একই।

দুই

কিইবা গল্প সীতার। এইতো কিছুদিন আগের আলো ঝলমল খুশীর রাত। দিদির বিয়ে। কোথা থেকে এলো যে সুরজিত। দাদার বন্ধুর ভাই। বিয়ে বাড়ীতে কাজ কি কম? সারারাত কাজ করল সন্ধ্যে থেকে। কাজের ছেলে। মা প্রশংসা করল। ও না থাকলে এত সব সামলাতো কে। বাবার সার্টিফিকেট। আর সীতা মনে মনে বলল, ওয়াণ্ডারফুল।

পরিবেশনের সময় কতবার যে সি ড়ি বেয়ে ওপর নিচে করল। সিঁড়িতেই দেখা সীতার সঙ্গে।

কি ওতে?

মাংস।

গুড্। দিন দেখি। মাংসের বালতিটা টেনে নিয়ে তরকারির খালি বালতিটা ওর হাতে ছেড়ে দিল।

বারে, বেশতো। আমাকে কাজ করতে দেবেন না নাকি আজ?

বালতি হাতে ওপর নিচে করা মেয়েদের কাজ নয়।

আমি পারি কিন্তু।

তা জানি। মেয়েরা কোন কাজইবা না পারে। কিন্তু বাহাদুরিটা কি না করলেই নয়?

মাংসের বালতি হাতে তর তর ক'রে ওপরের সিঁড়িগুলো উঠে গেল সুরজিত। তরকারির খালি বালতি হাতে অনেকক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সীতা।

একটু পরে আবার দেখা। দই কই।

লাল মুখটা পরিশ্রমে আরো লাল হয়েছে। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। কোঁকড়ানো চুলের ঝাঁক বার বার কপালে এসে পড়ছে।

চুলগুলো ঠিক করুন না।

কি করে করি? দেখছেন তো তরকারি আর মাংসর ঝোলে কি হাল হয়েছে হাত দুটোর। এ হাতে চুল সামলাতে গেলে মুখ কি থাকবে?

খিল খিল ক'রে হেসে উঠল সীতা।

বাঃ, বেশ আপনি, দিব্যি হাসছেন।

কি করব?

আমার জামার পকেট থেকে রুমালটা বার ক'রে চুলগুলোকে বেঁধে দিতে পারেন।

তাই করলো সীতা। হেসে বলল সুরজিত, ধন্যবাদ।

একটু চেনা, এমনি সুন্দর কাউকে একটুখানি পরশ করার জ্বালা সারা দেহেই শিরশিরিয়ে গেল।

মা বলল, অনেক কাজ করল যে-ছেলেটা, কি-যে নাম—

সুরজিত।

খাওয়া হয়েছে ওর?

কি জানি।

দেখনা একবার।

আবার খোঁজবার সুযোগ পেলো সীতা। খাওয়া হয়েছে আপনার?

নেমন্তন্ন বাড়ীতে খাইনা আমি।

না খেয়ে গেলে মা-বাবা সকলেই রাগ করবে কিন্তু।

আর আপনি?

আমিও। হেসে জানাল সীতা।

কিন্তু নেমন্তন্ন বাড়ীতে সত্যিই আমি কিছু খাইনা।

তা বললে শুনব কেন? দই মিষ্টিতো খান। দাঁড়ান, আমি নিয়ে আসছি। পালাবেন না যেন।

একটু পরেই কাঁচের প্লেটে দই মিষ্টি নিয়ে এলো সীতা।

ও বাবা, এ যে অনেক।

কিচ্ছু অনেক নয়। ভাল ছেলের মত খেয়ে ফেলুন দিকি।

আর আপনি, আপনি খেয়েছেন?

না, এখন আর খাবনা কিছু।

উঁহু। এ মোটেই ভালো নয়।

বিশ্বাস করুন, এখন আমার একটুও ক্ষিধে নেই।

বিশ্বাস করি না মোটেই। দেখি, হাঁ করুন দিকি। জোর করেই একটা রসগোল্লা ওর মুখে ফেলে দিল সুরজিত।

কাউকে ভালো লাগার এ এক আশ্চর্য সুর। এতদিন ভালো লেগেছিল সীতার অনেককেই, ভালো লেগেছিল কত কিই। মা, বাবা, দিদি, বড়দা, গীতা, নীতা কুণাল। ভালো লেগেছিলো বন্যাকে, ইন্দ্রদাকে। ভালো লেগেছিলো ধানতুলি পার্কের সেই বুড়ো মালিকে, ভালো লেগেছিলো দীননাথ স্কুলের তুলসী মাষ্টারকে। তবু এতদিনের এতো সব ভালো লাগার চেয়ে এ এক আশ্চর্য নতুন ভালোলাগা। কাউকে ভালোলাগা যে এতো ভালো হতে পারে, এ যেন আজ নতুন ক'রে জানা। তবু সুরজিতের মত কাউকে দেখা এইতো নতুন নয়। এইতো প্রথম নয়। কলেজে কত ছেলেই তো দেখেছে। ভাল, মন্দ, সাহসী, লাজুক। আলাপও তো হয়েছে অনেকের সঙ্গে। আর বন্যার সঙ্গে রাতদিন থেকে উদ্দাম তারুণ্য দেখবার অভাব তো কোনোদিনই হয়নি। কত ছেলেই তো ভাব করতে এসেছে বন্যার সঙ্গে, অন্তরঙ্গতার বেড়া বাঁধতে এসেছে। তাদের সকলের সঙ্গেই প্রথম সে সীতারই তো আলাপ ক'রে দিয়েছে। আর যারা বন্যার কাছে ঘেঁসবার সাহস জোগাড় করতে কেঁপেছে, তারা তো পা বাড়িয়েছে সীতার উঠোন পর্যন্তই।

মনে পড়ে সেই লাজুক সুশান্তকে।

আপনার সঙ্গে বন্যা দেবীর খুব আলাপ, না?

খুব।

আমার সম্বন্ধে আপনি যদি বলেন ওঁকে।

কি বলব? মজা লেগেছিল সীতার।

যা ইচ্ছে। যা আপনি ভালো মনে করেন।

তার চেয়ে আপনার নিজের কথা আপনি নিজেই বলুন না।

না, আমার ভয় ক'রে।

দুর, ভয় কি, আসুন না। ভারি শান্ত মেয়ে বন্যা।

সেদিন লাজুক ছেলেটাকে বন্যার সামনে হাজির ক'রে কি অপ্রস্তুতেই না ফেলেছিল সীতা।

তবু বন্যার সঙ্গে ভাব করবার ছেলেদের ভিড় কোনোদিনই কম হয়নি।

জিগ্যেস করেছে বন্যা, হ্যাঁ রে তোর খুব হিংসে হয়, না রে ?

কিসের হিংসে ?

এত ছেলে আমাকে চায়, তাই।

নাতো।

সত্যি ক'রে বল।

বারে, সত্যি করেই তো বলছি।

হ্যাঁ রে, ছেলেরা কেন আমায় এতো বিরক্ত করে রে ?

বারে, করবে না। কি ভালই না দেখতে তোকে। আমি ছেলে হ'লে তোকে সব আগে ভালবাসতাম আর সবচেয়ে বেশী।

কিন্তু তুই মেয়ে হয়ে তার চেয়ে আমায় অনেক বেশী ভালবেসেছিস। ওকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলো বন্যা। জানিস, আমার ভীষণ রাগ হয় ওদের ওপর। তোর দিকে কেউ আমার মত করে তাকায় না কেন।

আমি কালো আর কুৎসিত কিনা, তাই।

স্তাখ, ফের যদি নিজেকে কালো বলবি, আমি সারা গায়ে আলকাতরা মেখে বসে থাকব বলছি। তুই কালো, দোষ কি তোর ?

দোষ তো তার নয়। বুঝল বন্যা, বুঝল না কেন সুরজিত ? তবু মিথ্যে বলবে না সীতা, বন্যার এই ঐশ্বর্যে হিংসে ওর হয়েছিল। হিংস্রে হয়েছিল ওর চারপাশে ছেলেদের ভিড় দেখে। মনে হয়েছিল, সেও তো মেয়ে। বন্যা যা পায়, ও তা পাবে না কেন ? সমবয়সী আর একজনের এমন সৌভাগ্যে বুকটা যদি কখনো আনচান ক'রে ওঠে, তাতে দোষ কি খুব বেশী ? বন্যার মত তারও যৌবনভরা দেহের কানায় কামনার উদ্ধত ঢেউ উচ্ছলিত হয়ে ওঠেনি কি ? ছেলেদের ভিড়ে বন্যার কলহাসির পরশ যদি এক কোণে একলা বসা সীতার উদ্ধত বুকের শিহরণকে কখনো কোনোদিন আকুলিত

ক'রে থাকে, দোষ কি খুব ? যৌবন-জাগানো মেয়েমানুষের মন দিয়ে ভগবানের মত পাথর হয়ে যাবার তপস্যা তো করতে পারেনি। করতে চায়ওনি সীতা।

তবু ওর সবচেয়ে বড় বন্ধু বন্যাই তো। বন্যা ওকে কখনো দুঃখ দেয়নি। কালো বলে কখনো দূরে সরে যায়নি। বরং আদরে সব সময় কাছেই টেনে রেখেছে। ও যে কালো কুৎসিত কখনো জানতে দেয়নি বন্যাই তো। ওর হাসি দিয়ে, ওর রূপের আলো দিয়ে সব সময় ও সীতাকে ঘিরে রেখেছে কালোর কান্নাঝরা অন্ধকার থেকে। কে এমন পারে ? ওর কাছে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই সীতার। আর কাউকে ভালবাসাব প্রেরণা ওই মেয়েই তো দিয়েছে। ওর চারপাশে ভিড়-করা ছেলেদের মাঝ থেকেই ও ভাললাগার স্বাদ পেয়েছে। তবু সুরজিতকে ভাল লাগার মধ্যে আগে থেকে কোনোই তো অভ্যর্থনার আয়োজন ছিল না। ও জানতই না সুরজিত কে। জানতই না ও আসবে কিনা। তবু আশ্চর্য, অনেক শোনো সেই ইংরিজি কথাটার মতই, সুরজিত এলো, দেখল, জয় করল। হয়ত সুরজিতের এ জয় করাই, কিন্তু ওর তো হাবিয়েই যাওয়া। হারাতে এতো ভালো লাগে, কে জানতো। যেমন হারিযে গেলো বন্যা, অত ছেলের ভিড়ের মধ্যে নীল চোখ অমলেন্দুব সঙ্গে।

অমলেন্দুব গল্প শোনাতো বন্যা। অবাক হয়েই শুনত সীতা।

থাক, আর বলব না।

কেন রে ?

তোর শুনতে নিশ্চয়ই ভালো লাগছে না।

না না, বল না তুই।

ভাললাগা যে অতো ভালো, ভালবাসা যে এতো ভালো, বন্যাই তো প্রথম শোনালো।

বুকের সাজানো গুহায় দিল লোভেব শিশিরেব কৌটা।

তারপর সুরজিতের কথা শুনে একদিন হেসেই উঠল বন্যা। বেশ হয়েছে, এবার তুইও মজেছিস তো।

বারে, আমার কি দোষ। ওইতো সব করল।

বোকা মেয়ে, যা করবার ওরাই তো সব করে। ওরাই তো ভেঙেচুরে ভাসিয়ে দিয়ে যায়।

ভেঙেচুরে সব ভাসিয়েই তো দিয়েছিল সুরজিত। সেই ভাঙনের তীরে একটাই শুধু ময়ূরপঙ্খী নৌকা সুরজিতের। জায়গা তো চেয়েছিল সীতা। দিল কী? বলল, তুমি কালো, কুৎসিত। তোমায় নিয়ে আনন্দ করা যায়, গল্প ক'রে সময় কাটানো যায়। তার বেশী আর কিছু নয়।

আর কিছু নয়? বুকে দুরু দুরু কান্নার ঢেউ নিয়ে ওর দিকে তাকাল সীতা। না, আর কিছুই তো নয়। বলল সুরজিত, তোমাকে ভালবাসা যায় না, তোমাকে বিয়ে ক'রে ঘর বাঁধা যায় না। শুনল সীতা এ-তো কথা শোনা নয়, কান্না শোনা। ও যে কালো, আজ কান্না দিয়ে শুনল, বুকের সাজানো গুহায় অন্ধ মনের আত্মহত্যা দিয়ে শুনল, যৌবনের শিহরিত আবেগে জ্বালার পরশ নিয়ে শুনল। সুরজিত বলল, ক্ষমা কর আমায়। ক্ষমা করেছে সীতা নিজেকে, নিজের ভাল লাগার স্পর্দ্ধাকে, ভালবাসার ঔদ্ধত্যকে। কালো কুৎসিত মেয়ে হয়ে সুপুরুষ একজনকে ভালবাসার হৃদয়হীন দুঃসাহসকে। বন্যার মুখে ওর আর অমলেন্দুর ভাললাগার গল্প শুনে সীতার এতদিন যে ভালো লাগত, এই কি সেই ভালোলাগা। বন্যা বলে, ওরা সব ভেঙেচুরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই কি সেই সর্বনাশা ঝড়? জীবনে এই প্রথম ভাললাগার বাসর এমনি ভালবাসাতেই কি শেষ হয়ে যাবে? ঝড়ের ঝরা পাতা আর ঝরা ফুলে শিশিরের পরশ নেই, বৃষ্টির চুমু নেই, কান্নারই ফোঁটা শুধু।

খাওয়া শেষ ক'রে আবার ঘরে ফিরে এলো সীতা। জানালার কাছেই দাঁড়ালো আবার। বাইরে কালো আকাশে চাঁদের ছোঁয়া নেই, শুধু তারারই মিটিমিটি। সে কি কালো, ওই আকাশের চেয়েও কালো? কালো আকাশে চাঁদ আছে, তার চেয়ে বড় চাঁদ তার মনের আকাশে। আকাশে চাঁদের খোঁজ সকলেই তো ক'রে, তার মনের আকাশের চাঁদের খোঁজ কি করবেনা সুরজিত? বন্যা তো কতদিন বলেছে, রং নিয়ে কি হবে। মনটাই তো সবচেয়ে বড়। সে কি শুধু বন্যার সান্ত্বনাই? গায়ের রং-এরই

খোঁজ নিয়ে গেল কেন সুরজিত ? মনের রং-এ কোন রামধনুর রং ছড়িয়েছে সীতা, সুরজিত তার খবর নিলনা কেন ? কালো, কালো। কুৎসিত। ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়তে কে একজন ছেলে রাস্তায় মন্তব্য করেছিল, এই দেখ মা কালী যাচ্ছে। শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সীতা। এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার গালে একটা প্রচণ্ড চড় মেরেছিল। শুনে বন্যা খুশী হয়ে বলেছিল, বেশ করেছিস। সে-ঘটনা বন্যাই জানতো শুধু। আজ মনে হল সীতার, ঠিকই বলেছিল ছেলেটা। সত্যি কথার জন্যে অমন লাঞ্ছনা করা সেদিন অন্যায়ই হয়েছিল। অনেক দিন আগের সেই ঘটনা ; তবু আজ এতদিনের পর অনুশোচনায় ভরে উঠল সীতার মন।

পাশের ঘরে আলো নিভেছে। বাজল ক'টা ? কতক্ষণই বা পড়ে সীতা। এভাবে পড়া করলে পাশ আর করেছে। রান্নাঘরের কলরব শেষ হয়েছে। দাদার গলা পাওয়া যাচ্ছে। ক্লাবের আড্ডা ভেঙেছে নিশ্চয়ই। বাবা অফিসের কাজ নিয়ে বসেছে হয়তো। মা এবার ওপরে এসে আলো নিভিয়ে দেবে। রাত অনেক হয়েছে কি ? কে জানে। বাড়ীর রোজকার সুখী জীবনযাত্রায় ওই তো আজ হঠাৎ এক দুঃখের কোঁটা। রাতের পৃথিবীর খুশীর এলোমেলো হাওয়া। প্রহর কাটছে। স্তব্ধতার। সীতাই শুধু একলা ঘরের অন্ধকারে জানালার ধারে।

হয়ত ব্যর্থ এই বিষণ্ণ রাত জানালার ধারে দাঁড়িয়েই শেষ হ'ত সীতার। কেউ জানতনা, কেউ খোঁজও করতনা। আঘাত আর অপমানের বোঝা ওর দেহের আনাচে-কানাচে বিষাক্ত স্পর্শের মতই জমা হয়ে যেতো।

কিন্তু বেদনায় সমবেদনা দিতে এগিয়ে এলো একজন। ভালবাসার প্রথম খুশীতে খুশীর অভিনন্দন জানাতে বৌদিই তো এসেছিলো প্রথম।

ওমা, জানালার কাছে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ যে ?

এমনিই।

এমনি তো নয়। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।

কি আবার।

কি সে তুমিই জানো। এমনি ক'রে তো কোনোদিন দাঁড়াওনা। ওকে জড়িয়ে ধরল বৌদি। কি হয়েছে ভাই? কেউ বকেছে বুঝি?

কে আবার বকবে।

বকবার যে রয়েছে একজন, সেই বুঝি বলেছে কিছু?

রোজ রাতে বৌদির সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছে সীতা। সুরজিতের সঙ্গে ভাল লাগার খুশীর গল্প। সীতার মনের খোঁজ এ-বাড়ীর এই একটা মনই তো জেনেছে। ভালবাসার ভেজা মনের কথা এ-বাড়ীর আর কাকেই বা বলা যায়? খুশীর ইতিহাস জানিয়েছে বৌদিকে। আজ কান্নার ইতিহাস জানালনা। জানাতে পারলই না। জবাবে শুধু মুখ লুকোলো ওর বুকে। দুঃসহ আঘাতের একরাশ হু হু করা কান্নায় বৌদির বুকের ওপরের শাড়িটা অনেকখানিই ভিজিয়ে দিল।

কাঁদতে যে এতো ভালো লাগে কে জানত।

তিন

কান্নার রাতের শেষে যখন ঘুম ভাঙলো সীতার একরাশ খুশীর রোদ জানালায় চিক্‌চিক্‌ করছে। বিছানায় শুয়ে শুয়েই রোদ দেখল অনেকক্ষণ। কাল কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, কে জানে। এক রাতের আকুলিত কান্না কি সব বেদনাকে ভোলাতে পারেনা? পারে কই? সবই তো মনে পড়ছে আবার একে একে। যদি পারত! কাল বৌদির বুকে মুখ রেখে অমন কেঁদে ওঠা মোটেই ঠিক হয়নি। কি যে ও ভাবল কে জানে। বাবারে বাবা। এমন কাঁদুনে মেয়ে জন্মে দেখিনি।

মাই গড্, এখনো তুই ঘুমোচ্ছিস মেজদি। চায়ের পেয়ালার চুমুক দিতে দিতে ঘরে ঢুকল গীতা।

কেন, কি হয়েছে তাতে?

এখন ক'টা বেজেছে জানিস? এইট থার্টি।

তাতে কি। আমার তো পড়াশোনা নেই। ভোরে উঠবি তোরা।

বিছানার ওপর মাথার পাশে বসল গীতা। আজ কটায় উঠেছি জানিস? ফোর থার্টি।

গুড! হাসল সীতা। পরীক্ষার ভয় ঢুকেছে তাহলে?

দূর, ভয় আবার কিসের? রবীন্দ্রনাথ কি বলে গেছেন জানিস? ভয়কে যারা মানে, তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।

বিছানা থেকে উঠে সোজা কলঘরে গেলো। সেখান থেকে তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে সোজা রান্নাঘরে।

বৌদি ডিয়ার, টি।

আজ এতো দেরি যে? এই ঘুম ভাঙলো বুঝি?

হুঁ। ঘাড় নাড়ল সীতা।

দাঁড়াও। সেকেণ্ড রাউণ্ড চা তৈরি হচ্ছে তোমার দাদার জন্যে।

ভেরি গুড্। একটা পিড়ে টেনে নিল সীতা। আজ কিন্তু তোমার সঙ্গে চা খাব বৌদি।

হঠাৎ যে ?

বারে, খেলে কি হয়েছে ? প্লিজ। ওর গলাটা জড়িয়ে ধরল সীতা।

আচ্ছা আচ্ছা, খেয়ো। এখন ছাড়োতো। তোমার আদরে আমি বাপু মারা যাচ্ছি।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে বৌদি জিগ্যেস করল, কাল রাত্তে তোমার কি হয়েছিল শুনি ?

কি আবার।

কিসের ভূত মাথায় চেপেছিল ?

ওর কানের খুব কাছে এনে বলল, ভালবাসার ভূত। তারপর খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। হাসল, কিন্তু এক ঝাঁক কান্নারই ফোঁটা চোখ ফেটে বেরিয়ে এলো। তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো সীতা। কান্না লুকোতে না কান্না ঝরাতে, কে জানে।

ঘরে ঢুকে শাড়ীটা ছেড়ে, খোলা চুলগুলোয় খোঁপা বেঁধে, চটিটা পায়ে জড়ালো। মা জিগ্যেস করল, কোথায় আবার যাচ্ছিস ?

বন্যাদের বাড়ী থেকে আসছি মা।

সিঁড়িগুলো পেরোতেই বাবা ডাকল, টুনু, শোন তো।

কি বাবা ? দাঁড়িয়ে গেল সীতা।

তোকে আজ এমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন বলতো ? অসুখ-বিসুখ করেনি তো ?

তুমিতো রোজই আমায় শুকনো-শুকনো দেখো। তোমার চোখ খারাপ হয়েছে বাবা। চশমা নাও দিকি। হেসে বলল সীতা।

এখান থেকে বন্যাদের বাড়ী ট্রামের প্রায় ডজনখানেক টপেজ। ট্রামে যেতে পারত সীতা। তবু হেঁটেই গেল ইচ্ছে ক'রে।

ব্যাপার কি তোর বলতো ? ক'দিন দেখা নেই। ভাবলাম, সুরজিত ছোকরা শেষ পর্যন্ত তোকে নিয়ে পিট্টান দিল নাকি।

না, দেয়নি তো।

তবু ভালো। যাকগে, এ ক'দিনের বুলেটিন বল শুনি।

বুলেটিন নেই।

তার মানে ?

পৃথিবীতে সব কিছুরই শেষ আছে। বুলেটিনেরও।

কিন্তু বুলেটিনের শেষ তো বিয়ের আগে হওয়া উচিত নয়।

পৃথিবীতে উচিত নয় অনেক কিছুই। তবুতো হয়। আমরা সব ভাইবোন যখন ফর্সা, আমার তো কালো হয়ে জন্মানও উচিত নয়।

কি হয়েছে বলতো ? নিশ্চয়ই সিরিয়াস কিছু। ওর পাশে এসে বসল বন্যা। আমার কাছে লুকোসনি, ঠিক করে বল। তোর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, কয়েক রাত তুই যেন ঘুমোসনি। দেয়ার মাষ্ট বি সামথিং রঙ। বল শিগ্‌গির।

লুকোবোনা, তোকে বলতেই তো এসেছি। একটু থামল সীতা, একটু দম নিল। সুরজিত জানিয়ে দিয়েছে সেই কথাই, যা আমার জীবনের এতগুলো বছরে কেউ জানাতে চায়নি, জানাতে পারেনি।

অধৈর্য্য হয়ে উঠল বন্যা, কি জানিয়েছে, কি বলেছে, বলনা তাড়াতাড়ি।

বলেছে, আমার মত এ-চেহারার মেয়ের সঙ্গে হৈ-হল্লা করা যায়, আড্ডা মারা যায়, আনন্দ কি স্ফূর্তি করাও যায়, এর বেশী আর কিছু নয়।

বলল ও এমন কথা ? আর তুই শুনে গেলি চুপ করে ?

হ্যাঁ। আর মনে মনে ওর সৎ সাহসের প্রশংসাও করলাম।

আর বাড়ী ফিরে স্যারারাত কাঁদলি তো ?

হ্যাঁ, কাঁদলাম। না কেঁদে পারলাম না বলেই।

না, তোর দ্বারা কিছু হবে না, তুই একটা ওযার্থলেস্। আচ্ছামত শুনিয়ে দিয়ে আসতে পারলি না ?

কি হবে তাতে ?

মেয়েদের মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার মজাটি টের পাবে বাছাধন। চলতো আমার সঙ্গে, আয়তো ইয়াকি বার করছি রাস্‌কেলের !

না না, থাকগে। ওর হাত ধরল সীতা। এই নিয়ে তোকে আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবেনা সোনা। প্লিজ।

ওইতো তোর দোষ। তুই বড্ড ভালোমানুষ। টু গুড্। কিন্তু তোকে যে অপমান করলো তার কি ?

করুক। তার চেয়ে বড়, ও ভালবাসার অপমান করল।

তবু তুই কিছু করবিনা ?

কি করব ? জোর ক'রে বলব, আমায় ভালোবাসো, আমায় বিয়ে কর ? ওসব হ্যাংলামি আমায় দিয়ে হবেনা।

হ্যাংলামি আবাব কোথায়। ওসব ছেলেদেব এমন প্যাঁচে ফেলেই টিট করা দরকার। বলল বন্যা। কিন্তু ও জানে, এসব কিছু করবেনা সীতা, করতে পারবে না সীতা। বড্ড ভালো মেয়ে। বড্ড নরম। কান্নার আড়াল দিয়ে ঢেকেই সব দুঃখ সহ্য কবে যাবে। এত ভালো হ'লে কি চলে। এতো নরম মন নিয়ে কি আজকের মমতাহীন পৃথিবীতে বাঁচা যায়। কি হবে সেখানে মমতা ঝরিয়ে, যেখানে মমতা নেই।

ও আবার ডাকল, এই শোন।

সাড়া দিল সীতা, কি ?

সুরজিতকে তুই খুব ভালবাসতিস, না রে ?

জবাব দিলনা সীতা। একটা সিনেমা মাসিকের পাতা ওল্টাচ্ছিল, ওল্টাতেই লাগল। ভালবাসত কি বাসত না, সে জবাব শুনিয়ে এখন কি-ই বা লাভ। সত্যি মিথ্যে কোনো জবাবেই তো ক্ষতি নেই আজ।

একটা সুখবর ছিল রে ! আজ না হয় থাক।

থাকবে কেন, বলনা।

তোর মন এখন অস্থির। শুনতে তোর ভালো লাগবেনা।

মন আমার ঠিক আছে, বলনা তুই।

জানিস, অমলেন্দুব সঙ্গে বিয়ে আমার সেটেল্ড্।

তাই নাকি ? ভেরি গুড্! কে ঠিক করল ?

কে আবার, ও-ই। ও বলে কি, তুমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে বলনা। আমি বললাম, বাব্বা রক্ষে কর, তাহলেই হয়েছে। বাবা আমায় কেটেই ফেলবে। ওকেই পাঠালাম। যেতে কি চায়, এক নম্বরের ভীতু। অনেক সাহস দিয়ে পাঠালাম। তবু আমারও

যা ভয় করছিল, কি বলব। কি না কি হয়। তারপর কি জানি কি যে ও যাদু করল বাবাকে, রাজি হয়ে গেল বাবা।

এমন টুকটুকে মেয়েকে যে যাদু করেছে, সে তার বাপ্‌কে রাজী করাতে পারবেনা। কি যে তুই বলিস। হাসল সীতা। হাসতে পারল।

ফাজলামো করিসনে। কিন্তু তোর এ-দুঃখে আমার এ-খুশী একটুও ভালো লাগছেনা।

বারে, তাতে কি। ভালবেসে না পাবার দুঃখ পৃথিবীতে এই তো প্রথম নয়, পৃথিবীতে আমারই তো একা নয়।

তা হ'ক। ভাবছি, যতদিন তুই না হাসবি, এ-বিয়ে তোলাই থাক।

এই তো হাসছি আমি।

দুর, ওতো কান্না।

হাসল সীতা। সত্যিই তো হাসল। যেমন করে রোজ হাসে।

হোক কান্না। তবু তুই যদি সুরজিতকে হারাবার কথা ভেবে অমলেন্দুকে বিয়ে না করিস, সত্যি বলছি আমি আরো অনেক বেশী দুঃখ পাব।

ওকে আদরে জড়িয়ে ধরে গালে গোলাপি ঠোঁটের একটা মিষ্টি চুমু দিয়ে বললে বন্যা, তুই বড্ড ভালো। টু গুড। এমন ভালো মেয়েকে শুধু কালো গায়ের রং বলেই কি কেউ চিনবে না—চেনবার চেষ্টা করবে না?

চার

ভাত খেয়ে উঠে বিছানায় শুয়ে লাইব্রেরি থেকে আনা বইটা শেষ করছিল সীতা। বৌদি এসে পাশে বসল।

বন্যাদের ওখানে গিয়েছিলে, না? কি খবর ওর?

খুব ভালো খবর। জানো বৌদি, ওর বিয়ে।

তাই নাকি? তা, ছেলেটি কে?

অমলেন্দু। খুব ভালো ছেলে, দেখোনি তুমি?

না।

ওমা, সে কি! দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে একদিন আলাপ করিয়ে দোব।

না না, তার দরকার কি। তুমি যখন সার্টিফিকেট দিয়েছো, ভাল সে হবেই। এখন তোমার ভালো ছেলেটি এলেই বাঁচি।

ম্লান হাসল সীতা। এদেশে কালো মেয়ের বিয়ে কি হয় বৌদি? হয় না।

আহা, কত ভালো ঘরে বিয়ে হতে দেখেছি কালো মেয়েদের। এদেশে কালো মেয়েব সংখ্যাই তো বেশী। সুন্দরী আর ক'টা! আর মানুষেব রংটাই কি সব?

সুরজিতের মত ছেলের কাছে রংটাই তো সব।

এত বড় পৃথিবীতে সুরজিতই একমাত্র পুরুষ নয়। সুরজিতই পৃথিবীর পুরুষ মানুষের শেষ নয়।

বোঝালো বৌদি। বুঝতে চাইলনা সীতা। পৃথিবীতে মানুষের রংটাই বড় নয়, কালোই জগতের আলো—এমনি বড় বড় কথাই এতদিন শুনে এসেছে। মা বাবা থেকে সুরু করে সকলেই তাকে ভুলিয়ে এসেছে এতদিন, এমনি মনভোলানো কথায়। তা কি শুধু সান্ত্বনাই? তার বেশী, তার বড় কিছুই নয়? তা না হ'লে এতদিনের সবজানাকে শুধু একটা কথায় নিঃশেষে শেষ ক'রে দিল কেমন ক'রে সুরজিত? সুরজিত, যাকে ও পৃথিবীতে

সবচেয়ে বেশীই বিশ্বাস করেছিল—যাকে ওর প্রথম আশ্চর্য ভালো লেগেছিল।

পৃথিবীতে প্রথম ভালবেসে যা দুঃখ পেয়েছি, তারপর আর কাউকে ভালবাসতে চাইনা। এত তো পড়াশোনা করেছো, এও কি জাননা দুঃখ কখনো অভিশাপ নয়, আশীর্বাদই। ইন্দ্রদা, রবীন্দ্রনাথের সেই যে কবিতাটা আবৃত্তি করত, মনে পড়ে ? দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক বাঙালীর জয়।

ইন্দ্রদার আর কি, কবিতা আউড়েই খালাস। অমন কবিতা আমিও মুখস্থ ক'রে বলতে পারি। রাগ হ'ল সীতার। এই প্রথম রাগ হ'ল ইন্দ্রদার ওপর। কেন যে ওস্তাদি ক'রে নাম রাখতে গিয়েছিল, কৃষ্ণকলি। কৃষ্ণকলি, না হাতি।

শোনোতো এবার লক্ষ্মী-মেয়ে। তোমার দাদা বলে গেছেন, আজ বিকেলে তোমায় দেখতে আসবে। একটু সেজেগুজে থেকো।

আমি সাজবও না, দেখাও করবনা।

ছি, পাগলামি কোরোনা।

দূর, রোজ রোজ এই পরীক্ষা আমার ভালো লাগেনা।

ভালো না লাগলেও যে করতে হবে লক্ষ্মীটি !

এই নিয়ে ক'বার হলো জানো ?

তা জানিনা কি। কিন্তু একবার দেখাতে ক'টা মেয়েরই বা বিয়ে হয় ? খুব কম। আমাকেই কত বার দেখানো হয়েছে জানো, পাঁচবার।

ভালো লাগেনা। ভালো লাগেনা সীতার এই একঘেঁয়ে পরীক্ষা। যে পরীক্ষায় কোনোদিনই ও পাশ করতে পারবেনা, যতই বলুক বৌদি। মমতাহীন মানুষের কাছে রূপেরই পরীক্ষা শুধু। যে-পরীক্ষা জন্মাবার দিনই ভগবানের কাছে হয়ে গেছে। এর আগে যারা দেখে গেছে, তারা সবাই একই জবাব দিয়েছে, পছন্দ হয়নি। ওদের কি দোষ। সবলেই ফর্সা মেয়ে বিয়ে করতে চায়। সকলেই চায় ফর্সা মেয়ে বউ করতে। আজ যারা আসবে, তারা তো নতুন কিছু জবাব দেবেনা। পুরোনো

জবাব 'পছন্দ হয়নি'ই নতুন ক'রে শুনিয়ে যাবে। বারবার এভাবে অপমানিত হয়ে কি যে মজা পায় বাবা আর দাদা ?

দাদা অফিস থেকে ফিরেই বলল, টুনু কোথায় মা, তৈরিতো ? ওরা ছ'টার মধ্যেই এসে পড়বে কিন্তু।

মা বৌকে বলল, দেখতো বৌমা, ওর কদ্দূর।

বৌদি ঘরে ঢুকে দেখে সীতা বিছানায় কুঁকড়ে শুয়ে তখনও বই পড়ছে। আরে, বেশতো, এখনো বই নিয়ে রয়েছো ; তাড়াতাড়ি ওঠো।

বারে, কেন ?

কেন আবার কি। তৈরি হয়ে নাও। ওরা এলো বলে।

দুর। বলেছি তো ওসব আমার ভালো লাগেনা।

ভাল লাগেনা বললে চলবে কেন ? ওরা সব ছ'টার মধ্যে এসে পড়বে। তোমার দাদা তাড়া দিচ্ছে।

বাবা-দাদাব আর কি।

দাদা ঘরে ঢুকল, কি ব্যাপার, কি হয়েছে ?

বোন তোমার ওদের সামনে দাঁড়াতে রাজী নয়।

কেন, আবার কি হল ?

সীতা জবাব দিল, কালো মেয়ের আবার বিয়ে হয় নাকি ? কেন যে তোমরা মিথ্যে চেষ্টা করছ জানিনা।

কালো, কালো করিসনে। থাম দিকি। তাড়াতাড়ি সেজেগুজে তৈরি হয়ে নে।

গুম হয়ে বসে রইল সীতা। আমি সাজবও না যাবও না।

ছি, পাগলামী করিসনে লক্ষ্মীটি। আয়। দাদা আদরের হাত রাখল পিঠে।

বারবার না বলে যাচ্ছে, তবু কি তোমাদের মান-অপমান নেই দাদা ?

দাদা হাসল, মেয়ে পক্ষের কথায় কথায় অতো মান-অপমান জ্ঞান করলে কি চলে।

তোমাদের না থাক, আমার আছে।

মাথা গরম না ক'রে এখন তো চলে আয় টুনু। ওরা এসে গেছে। এখন আর বেইজ্জতি করিসনে আমাদের।

দাদার সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু ক'রে এলো সীতা। সকলকে নমস্কার ক'রে এক কোণে শাড়ী গুটিয়ে বসল।

বরের মামা চশমাটা নাকের ডগায় ঠেলে সীতাকে পরীক্ষা করলেন। এই মেয়ে? রং তো কালোই মনে হচ্ছে।

হেঁ হেঁ, তা একটু কালো বৈকি! বাবা আমতাআমতা করল।

একটু নয়, বেশ কালোই আমি। হঠাৎ মুখ খুলল সীতা। নিজের ছেলেমেয়েদের দোষগুণ সব বাবারাই কম ক'রে দেখে।

ধাক্কা খেলেন হঠাৎ বরের মামা। ধাক্কাটা সামলেও নিলেন তখুনি। তা ঠিক, তা ঠিক। এবার বর পক্ষের আর একজন প্রশ্ন শুরু করলেন। প্রশ্ন সেই একই। যার জবাব এমনি পরীক্ষায় সে বহুবারই দিয়ে এসেছে। কি নাম, কি পড়, গান জানো কিনা, রান্না জানো কিনা ইত্যাদি বহু প্রশ্ন।

বাকী সব প্রশ্নে সন্তুষ্ট হলেও বরের মামা খুঁৎখুঁৎ শুরু করলেন। কিন্তু মেয়ে আপনার বড্ড কালো।

আবার মুখ খুলল সীতা, তার জন্যে বাবার তো কোনো দোষ নেই। মানুষ তৈরির ভার মানুষের হাতে থাকেনা, থাকলে ফর্সাই হতাম। আর মেয়ে তাদের কালো হোক কোনো বাপ মা তা কখনো চায় না। আপনিও নিশ্চয়ই চাননা।

বরের মামা আবার ধাক্কা খেলেন, সে তো নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

বরের পক্ষের আর একজন মন্তব্য করল, মেয়ে আপনার বড্ড ফাজিল মশাই।

জবাব দিল সীতাই, মেয়ের কালো রং-এর জন্যে মেয়ের বাপকে যারা কথা শোনায়, তাদের সঙ্গে ফাজলামিই করা উচিত।

রাগে ঠক্‌ঠক্ করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন বর পক্ষ। কি, কালো কুচ্ছিত মেয়ের মুখে এতো চ্যাটাং চ্যাটাং কথা।

দুমদাম ক'রে উঠে পড়লেন সব ক'জন। ছি ছি, এ কি কাণ্ড! ভদ্দরলোকের বাড়ী ভেবে সম্পর্ক পাতাতে এসেছিলাম। ছোটোলোক, ছোটোলোক!

এক মুহূর্তে কি বিশ্রী এক কাণ্ডই না ঘটে গেল। হুড়মুড় ক'রে বর পক্ষের দল রাস্তায় নেমে পড়লেন। আর বাবা ফেটে পড়ল নির্বাক ঘরের দুঃসহ স্তব্ধতায়।

ছি ছি ছি, এ তুই কি কাণ্ড করলি বলত টুনু।

সীতার একটুও অনুশোচনা, অনুতাপ নেই। বলল, কি আবার।

ভদ্দরলোকদের অপমান ক'রে বলা হচ্ছে, কি আবার! ছি ছি, বাইরে আমাদের মুখ দেখাবাব আর জায়গা রাখলি না।

কাউকে অপমান করিনি আমি।

দাদা মুখ খুলল, অত কথা বলবার তোর কি এমন দরকার ছিল।

বেশ করেছি, বলব। হাজারবার বলব। তোমার এতগুলো ছেলেমেয়ের মধ্যে এই মেয়েটিই কেন কালো আর কুচ্ছিত হলো, কোনোদিন ডেকে জিগ্যেস করেছিলে কি বাবা ভগবানকে? কোনোদিন কি অভিযোগ করেছিলে ভগবানের কাছে? কেন করনি? করনি যদি, তবে ওরা যখন বলে মেয়ে আপনার কালো, তখন বলনা কেন এর জন্যে আমার দোষ নেই, আমার মেয়েরও দোষ নেই। বলতে কেন পার না? কেন, কেন?

ছুটে বাইরের ঘর থেকে পালিয়ে এলো নিজের ঘরে। দরজায় খিল তুলে বিছানায় ছড়িয়ে দিল নিজেকে। তারপর অনেকক্ষণ পরে দরজা ঠেলায় বৌদির গলা পেয়ে ও উঠে দাঁড়াল। দরজা খুলে দিল। বৌদি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পিঠে হাত রাখল একটু শুধু পরশ আদরের। এতক্ষণের কান্নার বাঁধ হঠাৎ যেন ভেঙে গেল অজস্র ধারায়। বৌদির বুকের শাড়ীটা কান্নার নোনা জলে ভিজে ভরে গেল। সমস্ত অপবাদ আর অপমানের আঘাত থেকে এই ছোট্ট ঘরেই বাঁচতে চেয়েছিল সীতা। বাঁচতে চেয়েছিল কান্নার আড়ালেই সব আঘাতের দুরন্ত বেদনাকে দুঃসহ জ্বালায় ঝরিয়ে।

অনেকক্ষণ পরে বৌদি বলল, চলো, এবার খাবে চলোতো।

না, ক্ষিধে আমার নেই গো।

একটু কিছু খাবে না? এসো।

রান্নাঘরেই খেতে বসেছে সবাই। বাবা, দাদা, গীতা, নীতা, কুণাল সকলেই। এতগুলো লোক একসঙ্গে খাচ্ছে, তবু কারো মুখে কোনো কথা নেই। স্তব্ধতার একটা থমথমে আবহাওয়া ছোট্ট এই রান্নাঘরে ডানা মেলেছে। একটু আগের হঠাৎ ঝড় এখনো যেন এ-বাড়ীর রোজকার হাসিখুশীর আবহাওয়ায় ভাঙা ডালপালার মধ্যে চিক্‌চিক্‌ করছে।

বোবা হাওয়ায় স্তব্ধতা ভাঙল সীতাই। বাবা আমি চাকরি করব।

বেশ তো।

মা বলল, মেয়ে মানুষের চাকরি আবার কেন ?

মা যেন কি। কত মেয়েমানুষই তো আজকাল চাকরি করছে।

তা করুক। তবু তোর কি এমন চাকরির দরকার শুনি ?

বাবা বলল, আহা করুকই না, ইচ্ছে হয়েছে যখন। কিইবা করবে বাড়ীতে বসে।

কুণাল পাশেই বসেছিল। সীতার গাল টেনে বললে, এই মেজদি, চাকরি করলে আমাকে একটা এয়ারগান্‌ কিনে দিবি কিন্তু।

দোব। কিন্তু এায়ারগান দিয়ে কি করবি শুনি।

কি আবার, তোকে যারা দেখতে আসবে সব ব্যাটাকে গুলি করে মারব।

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল সীতা। আর কেউ নয়। একটু আগের সেই থমথমে নীরবতা আবার যেন হঠাৎ থমকে পড়ল। সকলেই চুপ। বেফাঁস কিছু একটা বলে ফেলেছে বুঝতে পারল কুণাল। তাই তাড়াতাড়িতেই বলে উঠল, থাক রে তা হ'লে। আমাকে না হয় ভালো একটা ব্যাট্‌ই কিনে দিস।

না রে না, হেসে বলল সীতা, তোকে আমি একটা এয়ারগানই কিনে দোব।

খাওয়া শেষ ক'রে ঘরে গেল সীতা। জানালার কাছে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। আকাশের তারাদের মিটিমিটি। সেদিন চাঁদ ছিল না। আজ চাঁদের ছোট্ট একটা ফালি। বেশ লাগে চাঁদ দেখতে। খোলা দরজায় কার ছায়া পড়ল। বৌদি নয়, গীতাও নয়, বাবা।

দরজার কাছ থেকেই আস্তে ডাকল বাবা, টুনু, ঘুমিয়েছিস নাকি?

নাতো। এসোনা ভেতরে।

না না, আসবনা। ঘুমো তুই। অনেক রাত হ'ল। ঘুমো। বাবা তবু দাঁড়িয়েই রইল দরজার কাছে।

কিছু বলবে কি বাবা?

বলব? না না। একটু ইতস্তত করল বাবা। তখন তোকে খুব বকলাম, না রে?

কখন আবার? হেসে উঠল সীতা। দুর, ওকে আবার বকা বলে নাকি। তুমি যেন কি বাবা। বরং আমিই তখন যা তা বললাম।

না না, যা তা বলবি কেন। যা তা আবার কখন কি বললি। ওসব আজে বাজে না ভেবে ঘুমো দিকি। ঘুমো।

বাবা তাড়াতাড়ি নিজের শোবার ঘরের দিকে পা চালাল।

পাঁচ

সব শুনে বন্যা খুশীতে জড়িয়ে ধরল ওকে। বেশ করেছিস, ঠিক করেছিস।

উদাস কণ্ঠে সীতা বলল, কি জানি।

এতে জানাজানির কি আছে। ঠিকই তো করেছিস। এরকম না করলে ছেলের বাপেরা ঢিট হবে ভেবেছিস। কালো যদি হয়েই থাকিস, সে কি তোর দোষ ?

সত্যি কথাই বলেছিস তুই। কিন্তু সত্যি কথা বলতে যে এতো কষ্ট লাগে জানতো কে। এমন কড়া, শক্ত কথা কাউকে কখনো বলিনি। হঠাৎ কি যে একটা যা তা কাণ্ড ক'রে বসলাম। সারা রাত ভেবেছি শুধু।

এতে ভাববার কি আছে ? অন্যায় তো করিসনি কিছু।

কিন্তু ওদেরই বা দোষ কি। কালো মেয়েকে ওরা কেনই বা বাড়ীর বউ করবে।

কেন করবে না তাই শুনি ? মেয়ে ফর্সা হলেই তার সাতখুন মাফ ? যা কবেছিস তুই, ঠিক করেছিস। মিথ্যে ভাবিসনে আর। চল একটা সিনেমা দেখে আসি।

কোথায় রে ?

অতো কথার দরকার নেই। খুব ভালো একটা ছবি। আয়তো।

দেখাচ্ছে কে ? হিস্ হিস্, হুস্ হুস্ নাকি ?

উঁহু। অমলেন্দু দেখাবে।

তবে তোরাই যা। আমি তোদের দুজনের মধ্যে ঢুকে অসুবিধে ঘটাতে চাইনা।

ফাজলামি করিসনে। ওঠ বলছি।

যেতে যেতে বন্যা জিগ্যেস করল, সত্যিই তুই চাকরি করবি ?

সত্যি। কি আর হবে বাড়ী বসে বসে। আর চাকরি করলে বাড়ীরও কিছু সাহায্য হবে।

কোথাও খুঁজেছিস নাকি?

হ্যাঁ। তুইও চেষ্টা করে একটু দেখ না।

দাঁড়া, আজ বলে দেখি অমলেন্দুকে। ও পারবে ঠিক।

ওর চাকরি পাওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে গেল বন্যা আর অমলেন্দুর। আর এ বিয়েতে সব চেয়ে সুখী হ'ল সীতাই। ওর সুখে দুঃখে, আনন্দে বেদনায় সব সময় সঙ্গ দিয়ে এসেছে। সর্বান্তকরণেই চেয়েছিল সীতা, সে সুখী হোক। সুন্দরী হয়ে সুন্দরদের দলে নাম লেখাতে পারতো তো বন্যা। কিন্তু তা সে করেনি। প্রিয়বান্ধবী বলে ওকেই বেছে নিয়েছে পাশে।

ফুলে আর চন্দনে আশ্চর্য সেজেছে বন্যা। সুন্দরী মেয়েকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। গালটা ওর টিপে দিয়ে কানে কানে বলল সীতা, রাজার মেয়ে কাহার লাগি গাঁথছো মণি হার?

হেসে ফেলল বন্যা। বোস দেখি এখানে চুপ ক'রে। কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস বলত তখন থেকে?

কোথায় আবার। কাজ করছিলাম। বিয়েবাড়ীতে কাজ কি কম।

যাদের কাজ তারা বুঝবে। তুই কাজ ক'রে মরছিস কেন। বোস এখানে চুপটি ক'রে।

বারে, তোর বিয়ে মানে আমারই তো কাজ।

না, তোর কাজ ক'রে দরকার নেই। বসে থাক এখানে। একলা ঘরে বসে প্রাণ যাচ্ছে আমার।

আর একটু কষ্ট কর, দোকলা এলো বলে।

চুপ করতো। তুই আজকাল বড় পাকাপাকা কথা শিখেছিস।

হাসল সীতা। এই বেলা পাকাপাকা কথা বলেনি, আবার কখন সময় হবে কিনা কে জানে। যাই বল, আজ তোকে অদ্ভুত ভালো দেখাচ্ছে। ওয়াণ্ডারফুল। এখন অমলেন্দু থাকলে কি করত জানিস?

কি ?

ওর নরম গোলাপি ঠোঁটে আদরের একটা চুমু দিয়ে বলে উঠল সীতা, এই।

এই সীতা, তোকে ভীষণ আমি পিটব বলে দিচ্ছি।

খিলখিল ক'রে হেসে দুরে সরে গেল সীতা।

আবার যখন কাছে এলো অনেক পরে, বন্যা বলল, তোকে এতো ভালো কবে দেখাবে তাই ভাবছি।

কোনোদিনই না।

অমলেন্দু বলল, হয়ে গেছে, এবার দাঁড়ান, আপনার জন্যে উঠে পড়ে লাগছি।

বিয়ে আমি করবই না।

কেন ?

সব মেয়েকেই বিয়ে করতে হবে, তার কোনো মানে আছে নাকি।

আছে বৈকি।

বন্যা বলল অমলেন্দুকে, দাও তো ওর একটা জোর করে বিয়ে।

খুশী মনেই যে বিয়ে করতে পারত, তাকে জোর করার দরকার কি। হাসির কথা নয়, তবু হেসে হেসেই বলল সীতা।

তোর চিঠি পেলাম বন্যা। বিয়ের পর এতো তাড়াতাড়িই তোকে যে এ শহর থেকে দুরে চলে যেতে হবে, কে জানতো। জানলে তোকে বিয়ে করতেই দিতুম না। তুই সেদিন যখন এসে বললি যাচ্ছিরে বদলি হয়ে। বিশ্বাসই করিনি। যাক, তবু খুশীই হয়েছি। তোর সঙ্গে সঙ্গে অমলেন্দুর উন্নতি হ'ল। একেবারে এ্যাসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার। বলেনা, স্ত্রী ভাগ্য। সকলের কি স্ত্রী থাকে ? কিন্তু তুই যে আমার বড় ভাগ্যবতী সোনা। তোকে যে পাবে, তার ভাগ্য তো খুলবেই। সেদিন তোর বিয়ের রাতে তোকে একটা কথা জানাইনি। বাড়ী ফেরবার পথে মনটা সেদিন

ভয়ানক উদাস হয়ে উঠেছিল। কিছুদিন আগের দিদির বিয়ের সেই রাতটার কথা মনে পড়ল। আর মনে পড়ল সেই সঙ্গে সুরজিতকে। এমনিই এক খুশীর উৎসবের রাতে সে এসেছিল। একটুখানি কাছে এসে, একটুখানি হেসে, আশ্চর্য ক'টা কথা বলে ও মনটা আমার সারা জীবনের জন্যে এমন এলোমেলো ক'রে গেল যে, তার তুলনা নেই। তোর যাবার কথা শুনে ক'দিন থেকে মন খুব খারাপ লাগছিল। ভাবছিলাম বলি, তুই যাসনে বন্যা, থেকে যা এখানে। যাক্, অমলেন্দু একলা। তারপর ভাবলাম, ঠিক হবেনা বলাটা। স্বামীর ঘর তো করতেই হবে মেয়েদের। এখন না হয় রুখলাম। কিন্তু রুখতে আর ক'দিনই বা পারব? অমলেন্দুর সঙ্গে একদিন না একদিন তোকে যেতেই হবে। সেদিন ষ্টেশনে ট্রেনে উঠে তুই কাঁদছিলি, আর আমি সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম তোকে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমারই এতো কান্না পাচ্ছিল। বাড়ী ফিরে এসে ঘরে বসে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলাম। কেউ যখন কাছে থাকে সে বুকের কতখানি জুড়ে থাকে জানা যায় না। জানা যায় তখনই, যখন সে দূরে যায়। তাই নারে? তুই যে আমার বুকের কত কাছে বাসা বেঁধে আছিস, আমি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। তুইও না। সত্যি, একা একা একটুও ভালো লাগছে না। কবে আসছিস? তাড়াতাড়ি আয়না চলে। জায়গাটা কেমন? নতুন সংসার কেমন পেতেছিস তা তো কিছুই লিখিসনি। ঝগড়াঝাঁটি করিসনা তো ভদ্রলোকের সঙ্গে? তোর যা মেজাজ। রাগলে তোর মান ভাঙানো শিবের বাবারও অসাধ্যি। কাল একটা চাকরির ইণ্টারভিউ আছে। হয়ে যাবে তো মনে হচ্ছে। দেখি কি হয়। তাড়াতাড়ি চিঠি দিস। আর একটু বড় করে দিস বাপু।

বন্যা সোনা, তোর চিঠি পেলাম। এবার তোর চিঠিটা বেশ বড়ই হয়েছে। চাকরী-জীবন কেমন লাগছে জানতে চেয়েছিস। আপাতত মন্দ লাগছে না। বাড়ীতে চুপচাপ বসে থাকার চাইতে

এ অনেক ভালো। এখন তো বেশ ভালই লাগছে। পরে কেমন লাগবে কে জানে।

ইণ্টারভিউ দিয়ে যখন ফিরলাম, বাবা দাঁড়িয়েছিল গেটের কাছে। আমি বুঝলাম আমারই জন্যে। বাবা কিন্তু তা জানাতে চাইল না। জিগ্যেস করল, কেমন হ'ল রে?

বললাম, ভালই।

সেই কথা দাদা বৌদি সকলেই জিগ্যেস করল।

রাত্তিরে খেতে বসে গীতা ওর পাতের মাছটা আমার পাতে তুলে দিল হঠাৎ। আমি বললাম, এ কিরে?

কি আবার। ও হাসল। খানা।

তুই খাবি না?

তুই তো খা, মেজদি।

অবাক হয়েই ওর দিকে তাকালাম। আমার মাছের ভাগ কতদিন ওর পাতে তুলে দিয়েছি, হয়ত তারই শোধ দিল। মনে হ'ল, তা নয়, হঠাৎ ওর এই খুশী। আমার চাকরি পাবার সম্ভাবনাই হয়ত এই আনন্দের কারণ। কারণ যাই হোক, জানি আমায় ভালবাসেই গীতা।

এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারটা ডাকে এসেছিল। খামটা পিওনের হাত থেকে কুণালই নিয়ে এলো। এক দৌড়ে চীৎকার ক'রে সিঁড়িগুলো পটাপট লাফিয়ে ও বাড়ী মাথায় করল।

মেজদি, এই নে, তোর চাকরি হবার চিঠি।

কি ক'রে জানলি?

আমার যেন মনে হচ্ছে।

খুলে দেখি, তাই।

সকলেই খুশী হ'ল, মা ছাড়া। মা বলল, ছেলেদের মত গ্যাঁট গ্যাঁট ক'রে অফিস করবে মেয়েমানুষ, কি জানি বাপু, আমার তো মোটেই ভালো লাগছে না।

জানি, মার ভালো লাগবে না। সেই এক রত্তি মেয়ে কবে বউ হয়ে এ-বাড়ীতে এসেছে, ছোট্ট ঠাকুর ঘর আর এ-বাড়ীর চার দেয়ালের বাইরে কতটুকুই বা দেখেছে মা।

প্রথম মাসের মাইনেটা সব খরচাই ক'রে ফেললাম। শাড়ী কিনলাম মার জন্যে, গীতা, নীতা আর বৌদির জন্যে। বাবার জন্যে ধুতি।

বাবা খুশীই হ'ল। তবু বলল, এতো টাকা খরচ করবার কি দরকার ছিল আজেবাজে।

হেসে বললাম, বারে, আজেবাজে আবার কোথায়।

মা এসে বলল, টুনুটা এক নম্বরের পাগলি। আমার জন্যে কি শাড়ী এনেছে দেখো। এই রঙীন শাড়ী কেউ পরে নাকি।

বললাম, কি হয়েছে পরলে ?

হ্যাঁ, বুড়ো মাগী এই সব রঙীন শাড়ী পরে লজ্জায় মরি আর কি। লেখাপড়া শিখে তোমার মেয়ের আক্কেল দেখো।

গীতা মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, রঙীন শাড়ী পরলে তোমাকে যা মানাবে মা, ফাষ্ট ক্লাশ। একবার পরেই দেখোতো।

মা ওকে ধমকেই দিল, তুই থামতো, ফাজিল মেয়ে কোথাকার।

কুণালকে একটা এয়ারগান কিনে দিয়েছি। এয়ারগান দিয়ে ও পাখী মারবে না। তবে কি করবে জানিস্ ? যারা আমায় দেখতে আসবে, তাদের সকলকেই ও এয়ারগান দিয়ে গুলি করে মারবে। শোন, ওর কথা একবার।

কুণালের এয়ারগান দিয়ে গুলী করবার কথা শুনে তুই লিখেছিস আবার আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে কিনা। সেই কাণ্ডর পর বাড়ীতে বিয়ের কথা তুলতে আর কেউ সাহসই পায় না। অবশ্য শুনতে পাই দাদা আর বাবা আবার নাকি চুপি চুপি ছেলে খুঁজছে। তবু এটা ঠিক, আমাকে না জিগ্যেস ক'রে ওরা কেউ কোনো কথাই দেবে না। আর হলও তাই। একদিন বাবা ঘরে এসে ডাকল, টুনু শোন্।

কি বলতে চায় বাবা অজানা ছিলনা আমার। তবু না জানারই ভান করলাম। কিছু বলবে কি বাবা ?

ইয়ে, মানে ছেলেটা ভালই। মনে হয় রাজী হয়ে যাবে। যদি দেখা করিস।

দেখা দিতে কাউকে আর ইচ্ছে ছিল না। তবু বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রাজী হয়ে গেলাম। বাবার ভীতু অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মায়াই হ'ল।

না না, এবার আর কোনো গণ্ডগোলই করিনি। ভীষণ শান্ত হয়ে বসেছিলাম। আর আশ্চর্য কাণ্ড, কালো মেয়েকে ওদের নাকি পছন্দ হয়ে গেছে। তবে টাকা একটু বেশী চায়। কত টাকা জানিস? দশ হাজার। এই হ'ল একটু বেশী। ভারি বিনয়ী বলতে হবে কিন্তু ওদের। নারে?

টাকার অঙ্ক শুনে ক্ষেপে উঠলাম আমি। বাবাকে বললাম, থাক, এ-বিয়েতে দরকার নেই বাবা।

কেন, পছন্দ হযেছে তো ওদের।

যে পছন্দের দাম দশ হাজার, তাকে পছন্দ বলে না বাবা।

ইয়ে, টাকাটা একটু বেশীই চেয়েছে। দেখি জোগাড় করতে পারি কিনা।

জোগাড় করতে পারলেও এ বিয়েতে আমার মত নেই বাবা। আমার কালো কুচ্ছিত চেহারার জন্যেই কি এতো টাকা দিতে হবে?

বাবা আমতা আমতা করল, হ্যাঁ, অনেকটা তাই বটে।

তবে এতো টাকা দেবার দরকার নেই।

এর পর জবাব নেই। জবাব বাবারও ছিল না। বাবা কোন কথা বলতে না পারলেও, দাদা বোঝালো। এতে তো বোঝাবুঝির কিছুই নেই। তবু বোঝাবার কেন যে ওদের এতো চেষ্টা বুঝিনা।

বললাম, না। শক্ত হবার এ শিক্ষা তোর কাছ থেকেই পেয়েছি বন্যা। তুই তো কতদিন বলেছিস নরম মন নিয়ে বাঁচতে পারব না আজকের পৃথিবীতে। মন শক্ত করতে পারি-না-পারি কালো কুচ্ছিত হয়ে অন্যের ঘৃণার পৃথিবীতে বাঁচতে কিছুতেই পারব না। কালো বলে সুরজিত সেই যে প্রথম আমায় সত্যিকারের দুঃখ দিয়েছিল জীবনে, সেই দুঃখই আমায় শক্ত হবার শক্তি দিয়েছে। সুরজিতের ঘৃণাই হযত আমার নরম মনকে নিষ্ঠুর করেছে।

বোঝাতে না পেরে দাদা শেষে রেগেই উঠল। কালো মেয়ের কবে সস্তায় বিয়ে হয়েছে বলতে পারিস্?

বললাম, কোনোদিন হয়নি বলে, কোনোদিনই আর হবে না, তার কোন মানে নেই দাদা।

তারপর আর বিয়েব কথা উঠল না। মন দিয়েছি অফিসেব কাজে। অফিসটা হয়ে বেশ ভালই হয়েছে সারাদিন অফিসের কাজে ডুবে সব বেশ ভুলে থাকা যায়।

মা-ই শুধু মাঝে মাঝে চেঁচায়, তোমাদের হালচাল বুঝিনা বাপু। মেয়ে কি সারাজীবন আইবুড়ো হযে থাকবে নাকি ?

বাবা বলে, আমি কিছু জানিনা। ও কি চায়, ওকেই জিগ্যেস কর।

আশ্চর্য, মা কিন্তু আমাকে জিগ্যেস করতে সাহস পায় না।

ছয়

তোর চিঠি পেলাম বন্যা। শক্ত হবারই সাধনা করছি রে। যা কিছু চাইবার সব চেপে দিয়ে, যা কিছু পাবার সব ভুলে গিয়ে নরম মনকে শক্ত ক'রে শক্ত হবারই সাধনা করছি রে। মেয়ে হয়ে এ কাজ করা দুঃসাধ্যই তা জানি। তবু দুঃসাধ্যকেই সাধ্যে আনবার দুঃসহ কাজে দুরন্ত একাগ্রতায় নেমেছি।

কিন্তু একাগ্রতা ভাঙতে লোকের অভাব নেই তা তো জানিস। গীতা খালি হাসে। আগেও হাসতো; এখন কলেজে ঢুকে হাসি আরো বেড়েছে। ছাখতো ও যে ম্যাট্রিক পাশ করেছে এ সুখবরটা জানাতে তোকে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। যা ও আড্ডা মারত রাতদিন আর পড়তে বসলেই হাই তুলতো, তাতে ভাবিনি পাশ করতে পারবে। গীতা পাশ করাতে সবচেয়ে বেশী সুখী আমিই হয়েছি। ওর খুবই সাধ ছিল কলেজ-ষ্টুডেণ্ট হবার। আর ইচ্ছে ছিল এন সি সিতে ভর্ত্তি হবার। দিন দিন গীতাকে যা দেখতে হচ্ছে তোকে কি বলব। আর এন সি সির খাঁকি মিলিটারি পোশাকে ওকে যা ওয়াণ্ডারফুল দেখায়, তোকে কি বলব। দিনরাত হাসি আর কথা গীতার। আমার শক্ত হবার একাগ্রতা ওই তো ভঙ্গ করছে। মাঝে মাঝে ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাই। ওর অকারণ হাসি আর অফুরন্ত কথা শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যাই।

একাগ্রতা ভাঙবার লোকের অভাব অফিসেও কি কম। অফিসেরই একটা ছেলে, নাম সুধীর দাশগুপ্ত। কাজে অকাজে প্রায়ই আমার টেবিলের কাছে আসে। ওর মতলব বুঝতে পারি। মনে মনে হাসি। একদিন বলল, রিটার্ণস্ ফাইলটা কি আপনার কাছে আছে? একদিন বলল, আপনার পেন্‌সিলটা দেবেন একটু? আমার টেবিলের মুখোমুখিই ওর টেবিল। একদিন বলল, ড্রাফটা ঠিক হয়নি, রেফারেন্স চিঠিটা সব সময় সঙ্গে দেবেন। একই

অফিসে মুখোমুখি টেবিলে যখন বসি এটুকু কথাবার্তা; আলাপ পরিচয় স্বাভাবিকই। কিন্তু আমার দিকে সুধীরের মনোযোগ প্রয়োজনের অতিরিক্তই মনে হয়।

. একদিন বাড়ী ফেরবার সময় দু'জনেই এক সঙ্গে লিফট্ দিয়ে নামলাম। নিচে নেমে চলেই যাচ্ছিলাম, সুধীর ডাকল শুনুন।

দাঁড়িয়ে গেলাম। ডাকছেন আমাকে ?

হ্যাঁ। সামনে এসে দাঁড়াল সুধীর। কোথায় যাচ্ছেন এখন, বাড়ী তো ?

বাড়ীই।

ইয়ে চলুন না ওই হোটেলটায় যাওয়া যাক।

ধন্যবাদ। কিন্তু ক্ষিধে আমার নেই।

বারে, নেই বললেই কি বিশ্বাস করব নাকি ? সেই কখন খেয়ে বেরিয়েছেন। আর ক্ষিদে যদি নাও পেয়ে থাকে, এক কাপ কফি তো খেতে পারবেন। আসুন না।

পা বাড়ালাম, তুই বলবি, ওই পা বাড়ানোই আমার কাল হ'ল। তাই হয়ত। সুরজিতের কাছ থেকে ঘা খাওয়ার পর ঠিক করেছিলাম কোনো ছেলের ডাকে আর কখনো সাড়া দোবো না, তবু শক্ত হতে পারলাম না। কেন, কে জানে। শক্ত হওয়া যায় না-ই হয়ত। মন বলল, একটুখানি হোটেলে বসে গল্প করলে কি এমন হয়েছে ?

তারপর শোন। কফিই চাইলাম শুধু। ও জোর করে অমলেটও খাওয়ালো। পনের মিনিট বসে ও অন্তত পাঁচশোটা কথা বলল। আমি পাঁচটা কথাও বললাম কিনা সন্দেহ। খাওয়া হয়ে গেলে টাকাটা আমিই দিতে গেলাম। ও বললে বারে বেশতো, আমিই আপনাকে ডাকলাম, আমিই খাওয়ালাম, আর টাকাটা দেবেন আপনি ?

হেসে বললাম, না হয় দিলামই আমি, কি হয়েছে তাতে ?

তাতে অনেক কিছুই হয়।

ও মানিব্যাগটা বন্ধ করে আমার হাতের মধ্যেই গুঁজে দিল আবার। সেই সঙ্গে মনে হ'ল হাতটাও যেন ইচ্ছে ক'রেই টিপে.

দিল একটু। ওর শক্ত হাতের সবল ছোঁয়ায় সারা দেহটা হঠাৎ যেন শিরশিরিয়ে উঠল। এমনি শিরশিরিয়ে উঠেছে সারা শরীর সেই দিদির বিয়ের রাতে যখন স্বুরজিতের কপালে রুমাল বেঁধে দিয়েছিলাম উড়ে পড়া কোঁকড়ানো চুলগুলো রুখতে।

তারপর আর একদিন শনিবারের হাফ-ডের পর ও ধরল, চলুন না লিবার্টিতে। খুব ভালো একটা ছবি এসেছে।

বললাম, সিনেমা আমার ভাল লাগেনা। আর তা ছাড়া দেখিও খুব কম।

আচ্ছা মেয়েতো আপনি। কোনো কিছুতেই আপনার সখ নেই।

তাই। হাসলাম।

চলুন তো। এ ছবি আপনার ভালো লাগবেই। চলুন না। স্বুবীর হাতটা ধরে কাছে টানল হঠাৎ।

হাত ছাড়ুন কি হচ্ছে। বলতে চাইলাম, বলতে পারলাম না। সেই দিদির বিয়ের রাতে জোর করেই যখন স্বুবজিত আমায় রসগোল্লা খাইয়েছিল, বলতে তখনও তো কিছু পারিনি। ওরা এমনি জে'র করেই সর্বনাশ করে বোধ হয়।

তুই লিখেছিস, মজেছি। দূব, তা নয়। কোনো ছেলেব সঙ্গে দু'চার দিন ভাব হলেই অমনি মজে যাওয়া হ'ল নাকি? তবে আজকাল মনটা আগাব ভালো নেই। মাঝে মাঝে উদাস হয়ে অনেক দূরে পালিযে যায। এক এক দিন রাতে ঘুম আসতেই চায় না। তুই বলবি এসব মজবারই লক্ষণ। তোর আর কি।

হ্যাঁ, দিদি ক'দিনের জন্যে বেডাতে এসেছে। ওব ছেলেটা দেখতে কি লাভলিই না হযেছে। ফোলাফোলা নবম গাল দুটো, নীল চোখ, নরম রেশমেব মত কটা চুল। ওর সঙ্গে এই ক'দিনেই খুবই ভাব হয়ে গেছে। এই ভাবকে তুই ভালবাসা বলতে পারিস স্বচ্ছন্দে। ছেলেটার নাম রেখেছে দিদি খোকা। খোকা তো সব ছেলেরই ছোটোবেলার নাম। আমি ওর নাম রেখেছি টুটুল। ভালো নাম তো? টুটুল যখন তখন এসে আমার গলা জড়িযে ধবে। তখন সারা শরীর কেমন যে করে ওঠে তোকে কি বলব!

তাড়াতাড়ি ওকে ছাড়িয়ে দিই। কিন্তু ওর দাবী কি যে সে। হাম্ দিতে হবে। নরম ওর তুলতুলে গালে চুমু দিতে কি ভালোই য়ে লাগে। শুধু আমি কেন, মেয়ে দেখলেই ওর চুমু চাই।

কলেজে ঢুকে গীতা যা হৈ-হল্লা ক'রে বেড়াচ্ছে, আমরা কলেজে ঢুকে তার সিকি অংশও করিনি। আজ থিয়েটার, কাল সিনেমা, পরশু পিকনিক। কোনোদিন গানের জলসা, কোনোদিন নাচের রিহার্সাল।

মা সেদিন জিগ্যেস করল, হ্যাঁ রে, কলেজে কি পড়াশোনা হয় না নাকি রে?

কেন মা?

গীতাকে তো কোনোদিনই বই নিয়ে বসতে দেখি না। দিনরাতই তো শুধু টো টো করে ঘুরে বেড়ায়।

সেদিন রাত্তিরেই ডাকলাম ওকে, শোন তো।

ইয়েস্ মেজদি।

আজকাল পড়তে তো একেবারেই দেখি না।

হোয়াই ছোড়দি? এই তো ম্যাট্রিকে কি পড়াটাই না পড়লাম। প্রাণ একেবারে বেরিয়ে গেছে। এখন তো একটু রেষ্ট নিতে হবে।

রেষ্ট পেলে তো কিছুই চাস না জানি! আর রেষ্ট মানেই তো খালি হৈ-হল্লা আর আড্ডা।

প্লিজ, মেজদি। তুই বকলে মনে হয় পৃথিবীতে আদর করবার কেউ নেই। গম্ভীর হয়ে বলল গীতা।

গম্ভীর হলাম আমিও। বকব না তো, এবার থেকে শুধু মার।

মারবি তুই মেজদি? তাহলেই হয়েছে। খিল খিল ক'রে হেসে উঠল গীতা।

হেসে ফেললাম আমিও। আদর পেয়েই তুই গোল্লায় যাচ্ছিস।

গোল্লায়? না তো। তবে তুই যদি ক্যালকাটা হোটেলে রসগোল্লা খাওয়াতে নিয়ে যাস এক্ষুনি যেতে রাজি আছি।

এরপর কি ওকে বকা যায়, না কেউ বকতে পারে? তবে গীতার জন্যে মাঝে মাঝে ভয়ই হয়। বড্ড চঞ্চল ও, আর বড্ড সরল। এতো যে হাসে, কান্না কি তার পরের দিনগুলোর জন্যে তোলা রইল? হয়ত এ ভয়ের কোনো মানে নেই। হয়ত আছে।

কে জানে। আমি কাঁদি বলে হয়ত মনে হয়, সব মেয়েই আমার মত কাঁদবে। তবু গীতা যাতে সারাটা জীবন এমনি হেসে খেলে যেতে পারে তাই কামনা করি। বাবা তো বলে, লেট্ হার লাফ্।

সাত

এই চিঠিরই জবাব আশা করছিল সীতা। কিন্তু জবাব নয়, ওকে অবাক ক'রে দিতে বন্যা নিজেই এসে হাজির।

ওমা কি আশ্চর্য তুই। কখন, কবে, কি করে, কোত্থেকে কার সঙ্গে এলি? দু'হাতে বুকের সঙ্গে ওকে জড়িয়ে রাখল সীতা।

তোর আদরে প্রাণ বেরিয়ে গেল আমার। বললে বন্যা।

যাক্‌গে। ইস্ কতদিন তোকে আদর করিনি। হঠাৎ এলি? চিঠিতে তো কিছুই জানাসনি।

তোকে অবাক করতে। বল, অবাক হোসনি?

খুব। হাসল সীতা।

হঠাৎ এসে অবাক করে দেবার মধ্যেই তো মজা। আগে থেকে জানিয়ে এলে কিছুই চাম থাকে না।

একলাই এসেছিস?

আবার নাতো কি!

সাহস তো তোর কম নয়?

এতে আবার সাহসের কি আছে?

এমন লালটুকটুকে মেয়ে একলা গাড়ীতে আসছে দেখে কেউ যদি তোকে চুরি ক'রে পালাতো সোনা?

দিতাম না তাকে কামড়ে খিমছে শেষ ক'রে?

পারিস নাকি তুই?

নিশ্চয়ই, দেখবি?

না বাবা, দেখে দরকার নেই। অমলেন্দুর ওপর আজকাল এসব প্রয়োগ করছিস বুঝি?

করবার দরকারই হয় না। আমাকে একলা যেতে দিতে ওর আপত্তিই ছিল। রাজী হয় না দেখে, এমন দু'লাইন মোক্ষম কবিতার লাইন আওড়ালাম যে বাবাজী হ্যাঁ বলতে পথ পেলো না।

কি কবিতা আওড়ালি শুনি।

বললাম, নারীজাতির মুক্তি দেরে, মায়ের জাতির মুক্তি দে, নইলে তোদের বিজয় রথের চক্র আজি ঠেলবে কে ?

বিয়ের পর তোর শয়তানি আরো বেড়েছে দেখছি। তোর সব খবর বল দেখি ?

আমার আবার খবর কি, খাচ্ছি, দাচ্ছি আর ঘুমোচ্ছি। বরং তোর খবরই শোনা।

আমার ? ওর গালটা ধরে হেসে বলল সীতা, প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু আজ দিন যাবে আমার ভালো।

এতদিন দিন বুঝি ভালো যেতো না ?

না, তুই যে ছিলি না।

কেন বাপু, তোমার সেই অফিসের ছেলেটি তো রয়েছে।

ও সুবীর ? হাসল সীতা। ও নাথিং, ও একটা মোহ। প্রভাতে কে আর মনে রাখে বলো রজনী শেষের চাঁদে ?

তা রজনী শেষের চাঁদকে দিনের সূর্য তো করতে পারিস বাপু।

ফাজলামি করিসনে। বেশ মোটা হযেছিসরে তুই।

ওর কানে কানে বলল বন্যা, বিয়ে কর তোরও হবে।

রক্ষে কর বাবা, মোটা হবার জন্যে বিয়ে করতে হবে নাকি।

তবে রোগা হয়ে শুকিয়ে মব। ধমকে উঠল বন্যা। তারপর ওর ঘাড়ের ওপর মাথা রেখে বললে, হ্যাঁরে ছেলেটাকে দেখতে কেমন জানতে চেয়েছিলাম, লিখিসনি যে বড় ?

দেখতে কালো, মুখ ভর্তি বসন্তের দাগ। মেয়েরা যাকে সুপুরুষ বলে, ও তা একেবারেই নয়।

তা হ'ক, দেখাচ্ছিস কবে ?

যেদিন ইচ্ছে। আয়না একদিন অফিসে।

ভাব করিয়ে দিবিতো ?

নিশ্চয়ই। তোর কথা অনেক বলেছি ওকে। এতো বলেছি যে মনে হয় তোর সম্বন্ধে আমার চেয়ে ওই বেশী জেনে ফেলেছে।

হুঁ হুঁ বাবা, এতো কথাবার্তা হয়েছে এরই মধ্যে। আর বলা হচ্ছে মোহ। দোব নাকি গালে এক চড় ?

সত্যি কথাই তো বলেছি। ভালবাসার আর সাহস নেইরে।

তুই হচ্ছিস ভীতু নাম্বার ওয়ান। যাক্ ওসব কথা পরে হবে। এখন তোর চাকরির খাওয়ানটার ব্যবস্থা কর শিগগির। বেশ ফাঁকি দিলি যা হ'ক।

বারে, তখন তুই এখানে ছিলি কোথায়?

পার্শেল করেও তো মিষ্টি পাঠাতে পারতিস।

হ্যাঁ, ওই আমি করি আর কি।

সুবীরের সঙ্গে মেলামেশাটা হয়ত মেলামেশাই। হয়ত মোহ। তার বেশী কিছু নয় সীতার। হয়ত তার বেশী ও চায়ও না। হয়ত চাইতে পারে না। বন্যা বলে, এক নম্বরের ভীতু তুই। ভীতুই হয়ত। কাউকে ভাললাগার প্রথম পুরস্কার জীবনে ও আঘাত দিয়েই পেয়েছে। আবার যদি আঘাত পায় হয়ত আর সহ্য করতে পারবে না। বুকের অন্ধ গুহার দরজা হঠাৎ খুলে দিয়েছিল সুরজিত। ওর পরশে শিহরিত সর্বাঙ্গের শিরায় শিরায় যে পুলক পুলকিত হয়ে উঠেছিল, মনে হয়েছিল সীতার, এ-আনন্দের বুঝি তুলনা নেই। তারপর ওই তো একদিন বিষিয়ে দিয়ে গেল সব শিহরণ কান্নার কালো ফোঁটায়। কালো। ছোট্ট দুটো শব্দ যেন নিভিয়ে দিল ওর জীবনের সব আলোই। তাইতো আবার কাউকে ভালবাসতে এতো ভয় সীতার।

অমলেন্দুর গল্প শোনায় বন্যা। বিবাহিত জীবনের গল্প। ছোটো ছোটো ঝগড়াঝাটি-মান-অভিমানের গল্প। এক একটা ঘটনা শিশিরের ফোঁটার মতই যেন ঝক্-ঝকে আর পরিষ্কার। কবে ওস্তাদি ক'রে আলু কুটতে গিয়ে বঁটিতে হাত কেটেছিল অমলেন্দু, কবে মিথ্যে ক'রে মাথা ধরেছে বলে বিছানায় শুয়ে আধ ঘণ্টা ওকে দিয়ে মাথা টিপিয়েছিল বন্যা, কবে রাগ ক'রে রাত্তিরে পাশের ঘরে শুয়ে পায়ে ধরতেই বাকি রেখেছিল অমলেন্দুকে। কত মজার কাহিনীই না জমেছে এই ক'মাসে। গল্পের কি শেষ আছে।

সীতা বললো, তোর জয়ের গল্পই তো রোজ করিস, এবার হারের গল্প কর।

হার আবার কিসের?

তুই ওকে এতো জব্দ করেছিস, ও কখনো করেনি নাকি।

উঁহু।

বিশ্বাস হয় না।

করিস না।

দাঁড়া। আসুক তো অমলেন্দু, সব কথা জিগ্যেস করব।

আগে বলে তো দেখুক ও, মজা দেখাবো না।

ওর গালটা টিপে হেসে বলল সীতা তার মানে নিশ্চয়ই কিছু আছে।

আছে না হাতি।

ভারি ভালো লাগে বন্যার মুখে ওদের ভাললাগার গল্প শুনতে। লোভ কি হয় না? ওর মত ভালবাসা কাউকে দিতে, ওর মত ভালবাসা কারো কাছ থেকে নিতে লোভ কি হয় না? উঁচু বুকের জমানো ঐশ্বর্যে ভিজে ভিজে ঘামের ফোঁটায় উদাস হাওয়া শিরশিরিয়ে যায় না কি কখনো?

তবু কান্নার মতো ভর করেছে ভয়। এগোতে পারে না ও, কিন্তু সুবীর এগিয়ে যায়। সুবীরের অগ্রগতিকে তবু বাধা দিতে পারে কই সীতা? এমনিই হয়তো হয়। কাউকে ভালবাসার, কারো ভালবাসা পাবার দুর্বার লোভ হযত মেয়েদের চিরকালেরই।

সীতা বলল, বড্ড ভয় ক'রে আমার।

তোর এক এই ভয় হয়েছে। এমন রাগ হয় মাঝে মাঝে।

ভয় হয় রে বন্যা, হয়ত সুবীরও একদিন সুরজিতের মতই বলে বসবে আমাকে, আমি কালো, আমি কুৎসিত। সে আমি কিন্তু শুনতে পারব না।

বলবে কোন সাহসে শুনি? ও নিজেও তো কালো কুচ্ছিত।

সেটাই আমার একমাত্র ভরসা।

সেই ভরসাতেই বুক বাঁধলো সীতা। সুবীরও কালো। আর যাই বলুক, সুরজিতের মত অন্তত কালো বলে চলে যেতে পারবে না। সুন্দরকে ভালবেসে দুঃখ পেয়েছে, কালোকে ভালবেসে দুঃখ নিশ্চয়ই পাবে না।

আট

হ্যাঁ লোভই। কলেজের গল্প করে গীতা। কবে কোন ছেলেটা ইচ্ছে করে ওদের সামনে পেনসিল্ ফেলে পালিয়েছিল। কবে কোন্ ছেলেটা ইচ্ছে করে ভাব জমাতে চেয়েছে। কবে কে দু'লাইন প্রেমপত্র একটা মেয়ের ইংরিজি বইয়ের পাতায় রেখে গেছে। গল্প কি কম গীতার !

থাম দিকি, খালি তোর বাজে কথা।

এসব সত্যিরে মেজদি।

হোক। কলেজে এই সবই হয় বুঝি ?

বারে, পড়াশুনোও তো হয়।

হয় না, হাতি। তোর আর কলেজে পড়ে দরকার নেই। দাঁড়া, কালই বাবাকে বোলে তোর নাম কাটিয়ে আনছি।

লক্ষ্মীটি মেজদি, প্লিজ ওসব করিসনে। ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো গীতা।

এই ছাড় ছাড়, মারা গেলুম।

আগে বল, করবি না কিচ্ছু।

আচ্ছা, তাই। হেসে বলল সীতা।

পিকনিকের গল্প করে গীতা। কুড়ালিতে ডাকাতে কালি মন্দিরের গল্প করতে করতে বললো, হেনার কি সাহস জানিস মেজদি, একলাই চলে গেল ডাকাতদের পোড়ো বাড়ী দেখতে।

আর তোরা ?

আমরা গেলাম কোলার নদীতে বেড়াতে। খুব জল এখন। নামতে এতো ভয় লাগছিল। আর পল্লবটাও এতো পাজি, জোর ক'রে টেনে নামিয়ে দিল জলে। কোমর পর্যন্ত শাড়ী জলে ভিজে একাকার।

বকলি না কেন ?

বকলে ও বকুনি শোনে নাকি ! ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতেই দু'হাতে আমায় কোলে তুলে নিলো। বলল, চলো, তোমায় পার করে দিই।

আমি ওর মাথার চুলগুলো টেনে ধরে বললাম, এই শিগগির ছাড় বলছি। তা ও কি বললে জানিস, লক্ষ্মী হয়ে থাকো, দুষ্টুমি করেছো কি জলে ফেলে দোব।

পল্লব ছেলেটি কে ?

খুব ভাল ছেলে। ওয়াণ্ডারফুল।

তোর সঙ্গে খুব ভাব দেখছি।

সকলের সঙ্গেই ওর খুব ভাব। তারপর জানিস মেজদি মজাটা। ডাকাতদের পোড়ো বাড়ী দেখতে গিয়ে হেনার ফিরতে দেরি দেখে আমরা সবাই ভয় পেলাম। দল বেঁধে ওকে খুঁজতে যাওয়াই ঠিক হ'ল। ওমা, গিয়ে দেখি একটা ঝোঁপের মধ্যে হেনা দিব্যি মজা ক'রে সুজিতের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে গল্প করছে।

গীতার মুখে ওদের পিকনিকের দুরন্ত গল্প শুনতে শুনতে মনটা মাঝে মাঝে আনচান ক'রে ওঠে সীতার। লোভ হয় বৈকি। লোভ হয় ওদের এই চঞ্চল জোয়ারের রঙ্গীন প্রাণবন্যায় দুর্বার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

শোন, ছেলেদের সঙ্গে এতো হৈ-হুল্লা করা ভালো নয়।

বারে, কলেজের অনেক মেয়েই তো করে।

করুক। তোর করে দরকার নেই। তুই আজকাল বড় হয়ে উঠেছিস।

আহা, আর কেউ যেন বড় হয়নি।

তা হয়েছে। কিন্তু তোর মত বোকা ক'টা আছে শুনি ? আর সব তাতেই তোব হি হি হাসি, আর ধেই ধেই নাচ। তাইতো ভয় হয়। একটু গম্ভীর হতে চেষ্টা কর দেখি।

তুই আজকাল সব সময় আমায় অতো বকিস কেন বলতো মেজদি ?

ওর মুখটা কাছে টেনে জলে ভরা চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে হেসে বললো সীতা, বোকা মেয়ে ভালবাসি বলেই তো তোকে বকি। আর সে তো তোর ভালর জন্যেই।

নয়

হঠাৎ মা একদিন ঘরে ঢুকে বললো, তোর ব্যাপারটা কি বলতোরে টুনু। ভেবেছিস যা খুশী তাই করে যাবি ?

ভয়ই পেলো সীতা, কি হয়েছে মা ?

কি আবার হবে। হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। বিয়ে থা তুই করবি, না চিরকাল এমনি আইবুড়ো হয়েই থাকবি।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আশ্বস্ত হ'ল সীতা। হেসে বললো ও, এই কথা।

এতে যে হাসির কি আছে বুঝি না। তোদের রাতদিন ওই হাসি দেখলে গা জ্বলে যায় বাপু আমার।

হাসি থামালো না সীতা। বরং হাসি বাড়ালোই। বিয়ে কি না করলেই নয় মা ?

বিয়ে না ক'রে করবি কি শুনি ? সারা জীবন আইবুড়ো হয়ে থেকে ভাবছিস বড় বাহাদুরি দেখাবি ?

আজকাল কত মেয়েই তো বিয়ে না ক'রে থাকছে মা।

ভাবছেন ওঁরা খুব বাহাদুরি করছেন। বাহাদুরি। মেয়ে হয়ে জন্মেছেন, কোথায় বিয়ে করে ঘর সংসার করবেন, মা হয়ে ছেলেমেয়ে মানুষ করবেন তা নয়......বুঝিনা বাপু আজকালকার সব কাণ্ড-কারখানা। মা রাগে গর গর ক'রে ঘর ছাড়ল।

বিয়ে, ঘর সংসার, মা। অনেকদিন পরে কথাগুলো যেন নতুন ক'রে শুনল সীতা। মা। দিদির সেই নরম তুলতুলে ছেলেটার মতই ছোট্ট একটা ছেলে বার বার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবে, বার বার ঠোঁটে চুমু দিয়ে যাবে। কারণে-অকারণে ঝগড়া করবে বন্যার মত, অভিমান ভাঙাতে আসবে পরিচিত সঙ্গী।......ভাবতে আশ্চর্য ভালো লাগছে সীতার। দুটো মনের খুশীর মিল দিয়ে রাঙানো ছোট্ট একটা ঘর। থাকবে সে আর একজন। আর জ্বলজ্বল করবে তাদের কামনার মিলিত আকাশে একটি শুধু তারা রোজ রাতে।

পরের দিন সকাল বেলাতেই গীতা এসে জড়িয়ে ধরলো আদরে দু'হাতে। কিরে, ব্যাপার কি ?

এমনিই।

সকাল বেলাতেই আদরের এতো ঘটা দেখে সন্দেহই হচ্ছে।

বারে, সন্দেহ আবার কি। কতদিন তোমায় আদর করিনি মেজদি।

উঁহু, ভেতরে নিশ্চয়ই অন্য কিছু আছে। হাসল সীতা।

অন্য আর কি। হেসে ফেলল গীতাও। গম্ভীর হতে গিয়েও পারলো না। গালটা সীতার গালের কাছে আরো ঘন ক'রে আনলো। এই মেজদি, দশটা টাকা দিবি ?

কি হবে টাকা ?

এমনিই।

এমনিই কারো দশ টাকার দরকার তো হয় না।

তুই বড্ড জেরা করিস—

জেরা তো করতেই হবে। তোর একলা মেয়ের দশটা টাকার কি এমন দরকার পড়ল শুনি ? আজকাল যা কাণ্ড হচ্ছে চারধারে, তোর মনে কি মতলব আছে কে জানে ?

দূর, তুই যেন কি মেজদি! কয়েকজনকে সিনেমা দেখাতে হবে। ওরা সকলেই আমায় দেখিয়েছে। দেনা দশটা টাকা।

ওরা কারা ?

ও তুই চিনবি না। হেনা, শীলা, অলকা, বিনতা-সকলেই।

ছেলে বন্ধু কেউ নেইতো ?

না।

ঠিক তো ?

এবার ঠিক বলতে গিয়ে হেসেই ফেললো গীতা, আর থাকলেই বা কি হয়েছে, তুই বড্ড গোঁড়া মেজদি।

হঠাৎ একদিন মা বললে, গীতাকে তুই একদিন বেশ ক'রে বকে দিস তো। রোজ রোজ রাত ক'রে বাড়ী ফিরছে।

তুমিই বকে দিওনা মা।

আমার বকুনিকে এ-বাড়ীতে কেউ গ্রাহ্য করলে ভাবনা ছিল কি! মা আক্ষেপ করলো।

তবে বৌদিই দিক।

কুটনো কুটতে কুটতে বৌদি বললে, রক্ষে কর। কাউকে বকতে গেলে খালি হাসি পায় আমার।

তোমায় দিয়ে কিচ্ছু হবে না বৌদি, তুমি একটি হোপলেস।

গীতাকে ওই বকে। তবু ধমকাতে সেই বা পারে কই।

বারে রিহার্সাল দিতে দিতে রোজই যে রাত হয়ে যায়, বললো গীতা।

ওদের বললেই পারিস যে তোকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে। রাত হলে বাড়ীতে সবাই বকাবকি ক'রে।

বলেছি তো, শোনে না কেউ।

না শোনে, রিহার্সালের পাট চুকিয়ে দে।

বারে এখন ছাড়া যায় নাকি। কতদূর এগিয়েছি।

তার চেয়ে বল্‌না ওদের সঙ্গে হৈ-হল্লা করতে তোর খুব ভাল লাগে।

বলল না কিছুই গীতা। দিদির কোলে মুখ লুকোলো।

দাদা আর বাবা যদি জানতে পারে, তবে তোর বিকেলে বাড়ী থেকে বেরোনোই বন্ধ হবে, তা জানিস?

মেজদি ডিয়ার, প্লিজ বলিসনি। বলবি কি?

বলিনি কাউকেই আমি। কি হবে বলে? গীতাকে যে ভারি ভালো লাগে আমার।

ছেলেদের সঙ্গে হৈ-হল্লা করলে কি হয় শুনি?

বললাম, হয়ত হয়না কিছুই। কিন্তু হতে কতক্ষণ।

তুই এক নম্বরের ভীতু মেজদি।

হ্যাঁ, হয়ত ভীতুই আমি। কাউকে ভাল লাগার, কাউকে ভালবাসার দুরন্ত ভয় দেখিয়ে গেছে সুরজিতই আমায়। সে ভয় হয়ত আমি এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি, তবু কালো কুচ্ছিত সুবীর সাহস কি দেয়নি একটুও?

ভয় কিনা জানি না, তার পর থেকে গীতা থিয়েটারের রিহার্সাল সেরে তাড়াতাড়িই বাড়ী ফিরত।

তারপর হঠাৎ একদিন বেশ রাত হ'ল। খাওয়া শেষ ক'রে ও নিজের ঘরে ঢুকছিল, আমি ডাকলাম, শোন্ তো, আজ এতো রাত হ'ল কেনরে ?

হ্যাঁরে, আজ রাত হয়ে গেল অনেক। কি করব মেজ্দি, আমার দোষ নেই এতটুকু। পল্লব গাড়ী এনেছিল, বললো, চল একটু ঘুরে আসি।

আর তুই অমনি রাজি হয়ে গিয়ে উঠে পড়লি গাড়ীতে।

হ্যাঁ। কিন্তু আমি কি তখন জানতাম যে ওইসব কাণ্ড করবে ও!

কি কাণ্ড ?

প্লিজ কাউকে বলবি না বল।

উঁহুঁ।

জানিস, মেজদি, পল্লবটা কি বদমাইস, অকারণে ও আমাকে নিয়ে জড়িয়ে ধরে চুম খেলো একগালে। আমি বারণই করেছিলাম। ও কিন্তু শুনলই না।

চমকে উঠলাম, রিহার্সাল দেবার নাম ক'রে এইসব করা হয় হতভাগা মেয়ে।

সত্যি বলছি মেজদি, একটুও দোষ নেই আমার। বেড়াবার নাম ক'র—

চুপ কর। সবই তো তোর দোষ। রাত দিন ছেলেদের সঙ্গে হৈ-হল্লা করে বেড়ালে হবে না এ-সব।

তুইতো সব সময় আমারই দোষ দেখিস মেজদি। চেঁচিয়ে উঠলো গীতা। তুই কালো কুচ্ছিত, কেউ তোকে ভালবাসে না কিনা, তাই তুই আমার ভালো একটুও দেখতে পারিস না। তাই আমার ওপর তোর এতো হিংসে।

কালো, কুচ্ছিত। ঘৃণার বিষাক্ত ফণার মত সারা দেহ আমার ক্ষত বিক্ষত ক'রে দিল। আমি যে কালো, জীবনে এই দ্বিতীয়বার জানলুম সে রাতে। প্রথম জানিয়েছিল সুরজিত, আজ জানালো আমার বড় আদরের বোন গীতা। সেদিন করতে কিছু পারিনি, চুপ ক'রে শুনে গিয়েছিলাম শুধু। আজ চুপ করে শুনে যেতে পারলাম না। ঠাস্ ঠাস্ ক'রে ওর গালে দুটো চড় বসিয়ে দিলাম।

কাঁদল না গীতা একটুও, চেঁচালোও না। একটা কথাও বললে না। আমাকে ঠেলে সরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। দরজার সামনে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ ধরে চুপটি করে। ভাবতে লাগলাম ঘটনাটা। জীবনে কখনো কারো গায়ে হাত তুলিনি। গীতার গায়ে তো নয়ই। কেন যে হঠাৎ ওকে চড় মেরে বসলাম, কে জানে। সত্যিই তো আমি কালো, কুচ্ছিত। সত্যিই তো কেউ আমাকে ভালবাসে না। মিথ্যে কিছুই বলেনি গীতা। ওর এই হৈহল্লায়ভরা জীবন দেখে লোভই তো হয় আমার। হিংসেই তো হয়। মিথ্যে নয়। চালাক মেয়ে গীতা, ধরে ফেলেছে ফাঁকি।

সারারাত একটুও ঘুম এলো না। বিছানায় শুধু ছটফট্ করতেই লাগলাম। কালো কুচ্ছিত মেয়েকে কেউ ভালবাসে না। জানে বৈকি গীতা। কিন্তু ও কি জানে, এই কালো কুচ্ছিত মেয়েকেও ভালবাসতে পারে কেউ? সুবীরের চোখে যে আশ্চর্য মমতা দেখেছি, হাতের ব্যাকুল ছোঁয়ায় যে আকুলতা দেখেছি, কারণে অকারণে কাছে চাওয়ায় আর কাছে পাওয়ায় যে চঞ্চলতা দেখেছি, সে কি ভালবাসা নয় বন্যা? ভালবাসাই তো। এই ভালবাসাই গীতাকে দেখাবো, এই ভালবাসার কথাই ওকে শোনাবো। জানুক ও, দেখুক ও। রাতভোর বিছানায় ছটফট্ ক'রতে ওর অপবাদের ওর অপমানের জবাব দেবার কথাই ভাবলাম শুধু। মানুষ যাকে যত বেশী ভালবাসে তার আঘাত ততই বেশী করে বুকে লাগে কি?

বাড়ী চিনতাম সুবীরের। সকালে উঠেই ভাবলাম যাই একবার ঘুরে আসি। তারপর ভাবলাম, থাক। হঠাৎ বাড়ী যাওয়াটা ঠিক হবে না। বাড়ীর লোকের চাওয়ার মধ্যে আমার জবাবের সব চাওয়াই হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। চা খেয়ে পড়তে বসল গীতা। আমার সঙ্গে কথা বললো না। বলতে কি কিছুই পারত না? কত কিই তো ছিল বলবার। কাল রাতে তোকে কি সব যা তা বলেছি, প্লিজ রাগ করিসনে মেজদি। বলতে কি পারত না? দু'হাতে প্রতিদিনের মতো জড়িয়ে ধরে বলতে পারত না, আগে বল রাগ করিসনি, নইলে কিছুতেই ছাড়ব না। দম বন্ধ

হয়ে যাবার ভয়ে শেষে বাধ্য হয়ে আমাকে বলতে হ'ত, আচ্ছা বাবা আচ্ছা, এবার ছাড়তো। ও কি তা জানে না? তবু একটা কথাও বললো না। ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল গীতা।

অফিসে রোজকার মতই দেখা হ'ল সুবীরের সঙ্গে। রোজকার মতই দু'চারটে কথা বললাম। কিছু অফিসের কাজ সংক্রান্ত, কিছু মামুলি। রোজকার মতই টিফিনে কফি হাউসে কফি খেলুম। নানা কথা হ'ল সেখানে। তবু জিগ্যেস যা করবার ছিল, করতে পারলাম না। সময় হল না। সময় হলেও হয়ত ইচ্ছে হত না।

জিগ্যেস করলাম বিকেলে। রামদাস শেঠ পার্কের ফাঁকা দিকটায় সবুজ ঘাসে রোজকার মত পাশাপাশি বসে গল্প করতে করতে।

এক মুঠো ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে এক সময় জিগ্যেসই ক'রে বসলাম, একটা কথা জিগ্যেস করব সুবীর?

নিশ্চয়ই। একটা কেন, এক হাজারটা জিগ্যেস কর না।

তুমি আমায় ভালবাস সুবীর?

ও হাসল। হেসে বলল, এ কথা এতদিন পরে কেন?

আগে জিগ্যেস করতে ভয় করত যে।

ভয় কিসের?

আমি কালো কিনা, তাই।

আমার হাতটা ওর মুঠোর মধ্যে টেনে নিল সুবীর। তাতে কি, আমিও তো তাই।

সত্যি বল না, আমায় তুমি ভালবাস কিনা।

সত্যিই।

কথাটা শুনলাম। এই প্রথম শুনলাম কোনো ছেলের কাছ থেকে। তবু বিশ্বাস হল না। ভয়ই হ'ল। তাই প্রশ্ন করলাম আবার ভয় ভয় চোখে।

আমি কালো জেনেও?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।

আশ্চর্য একটা পুলক মাতালের মতই সমস্ত শরীর দিয়ে টলমল করে বয়ে গেল। সেই পুলকেই আবার খুশীর ঢেউ তুললাম।

কবে আমায় বিয়ে করবে ?

বিয়ে। সুবীর যেন আকাশ থেকে পড়ল। বিয়ের কথা এর মধ্যে কোথা থেকে যে এলো, তা তো বুঝতে পারছি না।

তবে তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও না ?

বিয়ের কথা এখনো তো ভাবিনি। তবে যদি বিয়ে করতেই হয়, কোনো ফর্সা সুন্দরী মেয়ে দেখেই কোরব। প্র্যাকটিক্যাল দিক্‌টাই ভেবে দেখো সীতা, তোমাকে বিয়ে করলে কালো কুচকুচে ছেলেমেয়ে যদি হয়, তবে তাদের বিয়ে দিতে কি অসুবিধেই হবে।

প্রশ্ন করলাম, তুমিও তো কালো, ফর্সা মেয়ে পাবে কি করে ?

পাব। কালো ছেলেদেরই তো ফর্সা মেয়ে বিয়ে করবার ঝোঁক হয়। আর কি জানো, তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে বাড়ীর কেউই রাজি হবে না। আমাদের বংশে কালো বউ কখ্‌খোনো আসেনি।

এরপর ওর পাশে বসে থাকা যায় না। থাকতে পারলামও না। হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

ওকি, চললে নাকি সীতা ? শোনো।

থামলাম না। এগিয়েই গেলাম।

রাগ করলে নাকি ? শোনো, শোনো। প্লিজ্‌, দাঁড়াও একটু।

হন্‌হন ক'রে পা চালালাম। দৌড়োলামই যেন। চারদিকের রোজকার নির্জন অন্ধকার আজ যেন আরো বেশীই মনে হ'ল। কান্নার বিষাক্ত কালো স্রোত চারপাশ থেকে আমায় বিষিয়ে দিতেই আসছে। পেছনে পায়ের শব্দ আসছে। সুবীর ডাকছে। আরো, আরো জোরে পা চালালাম। ও যেন ধরতে না পারে। ওর আলিঙ্গনে বিষ রয়েছে। ছুটতে ছুটতে কোনোরকমে বাড়ী এসে বাঁচলাম যেন। ঘরে ঢুকে হাঁপাতে লাগলাম যেন। সুবীর তো কালো কুচ্ছিতই। তবু ও ফর্সা মেয়েই চায়। ঘর বাঁধতে চায় সুন্দরীর সঙ্গেই। তবে আমার কি দোষ ? কালো হয়ে ফর্সা কোনো ছেলেকে কেন চাইব না ? কালো মেয়ে তা পারবে না কেন ? তুইই বলনা বন্যা, এ কিসের নিয়ম, এ কেমনধারা বিচার ? আমি অসুন্দর, কিন্তু আমার চাওয়ার চোখ তো কালো নয়। কালো মেয়ের চোখে যদি সুন্দর কাউকে ভালো লেগে

থাকে, সে কি তার অপরাধ? তাইতো ভালবাসলাম অসুন্দর সুবীরকে। কিন্তু তাকে পেলাম কই? বলনা তুই বন্যা কোন্ মানুষেব এ বিচার, এ বিচার কোন্ ভগবানের?

আলো জ্বলছিল গীতার ঘরে। টেবিলেব সামনে বই খুলে বসে রযেছে। পডছিলই হয়ত। ওর ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। কালকে ওকে চড় মেবেছিলাম। 'সেই অনুতাপটাই এখন বড় ক'রে বাজল। কাল রাতে কি আমার হয়েছিল কে জানে। হযত পাগলই হয়ে গিযেছিলাম। তবু কাল যা বলেছিল গীতা, আজ একটু আগে সেই কথাই তো শুনিয়ে গেল সুবীরও। তবু আজ তো আমি পাগল হইনি।

আস্তে ডাকলাম, গীতা।

কে, মেজদি। আযনা।

আস্তে আস্তে এগিযে গেলাম ওব কাছে। ওর একরাশ কালোচুলের এলোমেলো কোঁকড়ানো ঝাঁকে আদরে হাত বুলিয়ে দিলাম।

কাল তোকে মেবেছি, নারে?

দুব। হাসল গীতা। ওকে আবার মাব বলে নাকি। হাতে তোর এমটুও জোর থাকলে তো।

তোকে আমি মিছিমিছিই মেরেছি। কোনো দোষ নেই তোর। তুই যা বলেছিস, সে তো সত্যি কথাই।

সত্যি না হাতি। রাগের মাথায যা তা বলেছি তোকে। একটুও সত্যি নয। প্লিজ মেজদি কিছু মনে করিসনে।

না না, সত্যি কথাই তো তুই বলেছিস।

ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলাম। কান্না ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পেলাম না।

ওমা, কাঁদছে দেখ। কি বোকা। এই মেজদি।

ওকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলাম। যেমন কেঁদে-ছিলাম বৌদিকে জড়িয়ে ধরে সুরজিতের প্রত্যাখানের সেই প্রথম রাতে। তুই পরে বলবি, আমি এক নম্বরের ওয়ার্থলেশ। হয়ত

তাই। বলবি, তোর খালি কান্না আর কান্না। হয়ত তাই। কিন্তু সত্যি ক'রে বলনা বন্ধ্যা আমার এই কান্নার প্রহর কবে শেষ হবে?

পরের দিন দেখা হয়েছিল অফিসে সুবীরের সঙ্গে। দেখা তো হবেই। একই অফিস যখন। অবশ্য এখন ওরা আর এক ঘরে মুখোমুখি বসে না। অনেক আগেই অন্য ডিপার্টমেণ্টে বদলী হয়ে গেছে সুবীর, অন্য ঘরে। রোজকার মতই দেখা হ'তে হাসল। সীতা কথা বলল। টিফিনে দু'জনে কফি হাউসেও গেল। যেন কিছুই হয়নি কাল। রাগ করেনি সীতা ওর ওপর। দোষ কি ওর। দোষ পৃথিবীর কোনো মানুষেরই নয়। কার ওপরই বা রাগ করবে ও। তবু এতদিন অন্তরঙ্গতায় যে চাওয়া লোভী হয়ে উঠেছিল, সেই লোভের হাতই ও শুধু নিঃশব্দে গুটিয়ে নিল। সুবীরের সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগে ক্লান্ত প্রহরের বিষণ্ণ যে অবগুণ্ঠনে ও নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল, সেই অন্ধ গুহাতেই ও চুপি চুপি পিছু পা ফেলে ফিরে গেলো। খুশীর আলোর চেয়ে কান্নার অন্ধকারই ঢের ভালো। সীতার এই নিঃশব্দ পরিবর্তন সুবীর বুঝতে পারল কি না কে জানে। হয়ত পারল, হয়ত নয়। পারল কি, পারল না সে খোঁজ নেবার কিইবা দরকার সীতার। কথা কমিয়ে নিল সীতা রোজ একটু একটু করে, হাসি কমিয়ে নিল রোজ ফোঁটা ফোঁটা ক'রে। সতর্ক পা ফেলে রোজ একটা একটা ক'রে বাড়তি কথাকে কেটে ফেলা, এক একটা ক'রে বাড়তি হাসিকে মুছে দেওয়া, কষ্টই বৈকি। তবু তা করতে হয়।

কুণাল ঘরে এলো সীতার খোঁজে। এই মেজদি।

কি রে?

ওয়ান রুপি, প্লিজ।

কি হবে?

সিনেমা দেখব।

তুই আজকাল বড্ড বেশী সিনেমা দেখছিস।

বেশী আবার কোথায় এক মাসে চারটে বুঝি বেশী হ'ল? তুই যেন কি মেজদি।

আচ্ছা আচ্ছা, কমই হ'ল। ব্যাগ থেকে এক টাকার একটা নোট বার ক'রে টেবিলে রাখল। এই নে, যা ভাগ।

ভাগল না কুণাল। ডাকল আবার, এই মেজদি ?

আবার কি ?

তুই আজকাল এমন মনমরা হয়ে থাকিস কেন রে ?

কে বললে ?

দেখতেই তো পাচ্ছি।

তুই আবার দেখবি কি। আর বাড়ীতে কতক্ষণই বা থাকিস তুই। সারাদিন তো টো টো ক'রে ঘুড়ে বেড়াস।

নারে, সত্যি ক'রে বলনা। মুড্ ভালো নেই বুঝি তোর ?

তাই।

তবে চল এক্ষুনি আমার সঙ্গে লিবার্টি সিনেমায় বব হোপের কাছে।

সে আবার কে ?

আরে রাম রাম, বব হোপের নাম শুনিসনি মেজদি ? তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না, তুই একেবারে হোপ্‌লেশ। বব্ হোপ হ'ল হলিউডের নামকরা কমেডিয়ান। ওর ছবি দেখতে গেলে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরবেই। ওর ছবি দেখতেই তো যাচ্ছি। চলনা তুইও। একঘণ্টার মধ্যে মুড্ তোর একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাশ হয়ে যাবে।

দুর ওসব সিনেমা টিনেমা আমার ভালো লাগে না।

এ ছবি তোর ভালো লাগবেই। চলতো। ওঠনা মেজদি। ওর হাত ধরে টেনে ওঠালো কুণাল চেয়ার থেকে। তাড়াতাড়ি শাড়ী বদলে নে, নইলে দেরী হয়ে যাবে।

বেরুবার মুখে বৌদি ধরলো। ভাইবোনে সেজেগুজে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি ?

লিবার্টিতে বৌদি। কুণাল জবাব দিল।

বাঃ বেশ, আমি বুঝি বাদ ?

বারে বাদ কেন, তুমিও যেয়ো একদিন। এটা শুনলাম নাকি খুব হাসির বই। যারা হাসে না তাদেরই জন্যে বিশেষ ক'রে।

সিনেমা দেখে তোমার তো হাসবার দরকার নেই বৌদি, তুমি রাতদিনই তো হাসছ। বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল সীতা।

ফিরতে গীতা ধরলো, হ্যাঁরে তোরা নাকি সিনেমায় গিয়েছিলি মেজদি? বৌদির মুখে শুনে তো আমি অবাক।

হ্যাঁ, কুণালই জোর ক'রে ধরে নিয়ে গেল। বললে বব্ হোপের বই এসেছে—হাসতে হাসতে সব মুড্ ভালো হয়ে যাবে।

বেশ করেছিস। গীতা বলল।

কি, মজা লাগেনি মেজদি? বল্‌তো সত্যি করে।

সত্যি, যা হাসায় লোকটা। আমার তো এখনো পেট ব্যথা করছে।

তোকে সিনেমায় টেনে নিয়ে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। কুণাল আজ অসাধ্য সাধন করেছে বলতে হবে।

কিন্তু ও কি কম পাজি। প্রথমে একটা টাকা নিয়েছিল আমার কাছ থেকে। সে টাকাটা তো খরচা হ'লই, উল্টে আমার আরো দুটো টাকা খসালো। তার ওপর ইণ্টারভালে চপ্ তো আছেই।

তুই বড্ড ভালোমানুষ কিনা, তাই সকলেই তোকে বোকা বানায়।

হয়ত সত্যি। হয়ত ওর কথাই ঠিক। তবু ম্লান একটু হাসলই সীতা।

দশ

আই, এ, পাশ করেছে গীতা। খবর পাওয়া গেল।

ওকে ডেকে বলল গীতা, পাশ করেছিস শুনে তোকে একটা কিছু দিতে ইচ্ছে করছে। কি দোবো বলতো?

কি আবার।

তোর যা ইচ্ছে।

আমার কিচ্ছুই চাইনা।

কিচ্ছু না?

নারে। না চাইতেই যে সব দেয়, তার কাছে আবাব চাইতে হয় কিছু।

ও, তাই। আমি ভাবছি তোর এবার বিয়ে দেওয়া দরকার।

যাঃ মেজদি, বাজে কথা বলতে হবে না। টল্‌টলে ওব গোলাপি মুখটা আরো গোলাপি হয়ে উঠল লজ্জায়।

এ মেযের বিয়েরই তো দরকার। কাণায কাণায় ভবে উঠেছে সুধার জোয়ার। এই তো জোযাবেব বেলা। রামধনুর মত রঙীন ঢেউ ওখানে চঞ্চল বেদনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে জানে বৈকি সীতা।

সীতাই একদিন বলল, এবাব গীতার বিযে দাও বাবা।

দেওয়া তো দরকার। কিন্তু ভাবছি।

আমার কথা ভাবছ তো বাবা। বিয়ে আমি করব না।

করবি না?

বাবার মুখের দিকে তাকাল সীতা। দুটো চোখে এতো মমতা আগে কখনো দেখিনি। বলল, না বাবা। এই তো বেশ আছি। দুঃখ যদি পাই, বিয়ে করলেই পাব। আর আজকাল কত মেয়েই তো বিয়ে না ক'রে রয়েছে।

তা তুই করবি কি শুনি?

করবার কাজ কত কিই তো রয়েছে বাবা পৃথিবীতে।

আর কিছু বলল না বাবা। বলতে পারলো না। তবু জানে সীতা, বলতে অনেক কিছুই হয়তো চেয়েছিল বাবা।

গীতা সুন্দরী মেয়ে। উদ্বেলিত যৌবন দেহের কাণায় কাণায়। একরাশ খুশীর ঢেউ সেখানে অহরহ বুদবুদ কাটছে। ওর বিয়েতে হাঙ্গামা নেই। ওর জন্যে ছেলে খুঁজতে কষ্ট নেই। জানে সীতা, গীতার মত মেয়েকে বিয়ে করতে যে কোনো ছেলে বিনা দ্বিধাতেই রাজি হবে। এমনি মেয়ের জন্যে ছেলে খুঁজতেই তো আনন্দ।

গীতা খবর পেয়ে বলল, আমি বিয়ে করব না মেজদি।

কেন, এর মধ্যে আবার কি হল ?

এমনিই।

কি করবি, তা হ'লে শুনি ?

তোর মত চাকরিই করব।

সব মেয়েই যদি চাকরি ক'বে, তবে বিয়েটা করবে কারা শুনি ?

ও একটু থেমে বলল, তবে তুই চাকরি করছিস কেন ?

আমার কথা আলাদা।

তোর কথা সব আলাদা না ? রেগে উঠল গীতা। নিজে দিব্যি চাকরি করবি, আর বাকি সবাইকে ফাঁসাবি ? এমন রাগ হয় তোর ওপর।

হাসল সীতা। ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, কিন্তু আমার তো তোর ওপর একটুও রাগ হয় না।

রাতে খেতে বসে বড়দা বলল, গীতার জন্যে ভালো একটা পাত্র পেয়েছি বাবা। বেশ ভালো ছেলেটি। এখন চাকরিও ভালো করছে।

কে, কোথায় থাকে ? বাবা ডালের বাটির দিকে হাত বাড়াল।

তোমরা দেখেছো তো ওকে। সেই যে ইতার বিয়ের সময় কত কাজ করলো। খুবই ওয়েল্ ম্যানারড। সুরজিত নাম ছেলেটির।

মা মাছের ঝাল পরিবেশন করছিল। শুনে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ভারি চমৎকার ছেলেটি। যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনি কথাবার্তা। গীতার সঙ্গে ওকে ভালোই মানাবে।

কি বল ?

তাতে কোন সন্দেহই নেই।

হঠাৎ গলায় ভাত আটকে কেসে ভাত ছড়িয়ে এক কাণ্ড করে বসলো সীতা।

কি হলরে ? বাবা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

না না, ও কিছু নয়। এক গেলাস জল শেষ ক'রে শান্ত হ'ল সীতা।

কুণাল বললে, দিদিকে কেউ মনে করছে বোধ হয়।

কে মনে করছে ?

কে আবার, বন্যাদি হবে নিশ্চয়ই, গীতা বলে উঠল। মেজদির ফার্স্ট ফ্রেণ্ড।

বাবা আবার বিয়ে প্রসঙ্গে নামলো। তা সুরজিতকে বিয়ের ব্যাপারে কিছু জিগ্যেস করেছিলি নাকি ?

হ্যাঁ। ওর আপত্তি নেই। গীতাকে ওর পছন্দ হয়েছে।

দেখেছে বুঝি ওকে ?

কি যে তোমার কথা বলার ছিরি। মা ধমকে উঠল। কতবার এ বাড়ীতে এসেছে সুরজিত, আর গীতাকে দেখেনি ? আজকালই না হয় আসেনা।

ঠিক ঠিক। তা হ'লে তুই ওখানেই কথাবার্তা সুরু করে দে।

দাদা সীতার দিকে তাকাল। তোর কি মনে হয়রে টুমু ? তুইওতো কতবার সুরজিতকে দেখেছিস, কথাবার্তাও কয়েছিস।

ভাল। অনেক কষ্টে এই একটা কথা উচ্চারণ করল সীতা। তারপর উঠে গেল হঠাৎ।

কিরে, সব পড়ে রইল যে।

ক্ষিদে নেই মা আজ।

কোন্‌দিনই বা তোর ক্ষিধে থাকে জানি না বাপু। মা গজ গজ করতে থাকে রাগে।

নিজের ঘরে ঢুকে বাঁচলই যেন সীতা। সুরজিতের নাম শুনে দাদার মুখে তখনই প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল সীতা। কিন্তু পারল না। চীৎকার করার ভাষা পেলো না। কথাগুলো গলা থেকে ঠোঁট

অবধি এসে কেঁপে কেঁপে দুঃসহ আবেগে আবার ফিরে গিয়ে বুকের অন্ধ গুহাতেই বোধহয় লজ্জায় মুখ লুকোলো। ভালই হয়েছে ওর চীৎকার কেউ শোনেনি। ভালই হয়েছে ওর প্রতিবাদ ভাষা পায়নি। তবু প্রত্যাশার বিস্মিত কোণে অপ্রত্যাশার প্রদীপ হাতে খুঁজে খুঁজেও ভাবেনি কখনো সীতা যে, দাদা সুরজিতেরই নাম করবে। এতো ছেলে থাকতে সুরজিত ছাড়া আর কাউকেই কি খুঁজে পেলো না বড়দা? সুরজিতের পছন্দ হয়েছে গীতাকে। হবেই তো। ও মেয়েকে ভালো কোন্ ছেলেরই বা না লাগবে? ও নিশ্চয়ই বলেনি দাদাকে তার কথা। বলতে চায়নি কি বলতে পারেনি, তাই বা কে জানে। বলবে কি সীতা? বলবে কি চীৎকার ক'রে সুরজিতের বিশ্বাসঘাতকতার বিষাক্ত কাহিনী? সে কথা জানে মাত্র দু'জনই, শুধু ওরা ছাড়া। এ বাড়ীর একজন, বৌদি; এ বাড়ীর বাইরের একজন, বন্যা। বলবে কি দাদাকে ভাল ছেলে সুরজিতের ভাল লাগার ইতিহাস? যে ইতিহাস ভাল লাগার সুরুই শুধু করেনি, শেষও করেছিল। যে ভাল লাগা খুশীর শিশিরই জমায়নি শুধু, কান্নার ফোঁটাতে তাদের নিশ্চিহ্নই ক'রে দিয়েছিল চিরদিনের মত। বলবে কি?

বৌদি ঘরে ঢুকল। কি হচ্ছে চাকুরে মেয়ের, খোঁজ নিতে এলাম।

খোঁজ নিতেই এসেছো শুধু, না খোঁজ কিছুর দিতেও এসেছো?

শুনেছো তাহ'লে মনে হচ্ছে। খাটে এসে বসলো বৌদি।

হ্যাঁ। আর জানতাম, খবর পেয়ে এ-বাড়ীর সকলের আগে কেউ যদি ছুটে আসে আমার কাছে, তো তুমিই আসবে।

মনটা তোমার খুব খারাপই হয়েছে, না?

নাতো। কে বললে?

তবে কিছু না খেয়ে উঠে এলেযে বড়!

ক্ষিধে ছিল না তাই।

আর কাউকে বোকা বানিও চালাক মেয়ে, আমাকে নয়। বৌদি ওর কাছে আরো ঘন হয়ে বসল। বিয়ের কথা শুনে তুমি

নাকি তোমার দাদার কাছে সুরজিত সম্বন্ধে মতামত দিয়েছো, ভালো ছেলে ?

হ্যাঁ।

কেন ?

কেন আবার কি। ভালোকে ভালো বলব না ?

চেহারা ভালো হলেই যদি মানুষ ভালো হ'ত, তা হ'লে তো কোনো ভাবনাই ছিল না। ভালো না ছাই।

তাই নিয়ে তোমার মাথা ঘামিয়ে লাভ কিচ্ছু নেই। হাসবার চেষ্টা করল সীতা।

খুব আছে। ভাবছি তোমার দাদাকে সব কথা বলে দিই।

তাতে ফলটা আর কি হবে ?

শুনলে তোমার দাদার ভালো ছেলের লিষ্ট থেকে সুরজিতের নাম এক্ষুনি কেটে যাবে।

তা হয়ত যাবে। কিন্তু কি হবে ? গীতা হয়ত ভাববে হিংসেতে বানানো গল্প ফেঁদে আমি এই কাণ্ড করেছি।

ছি ছি, কি যে বল। এমন কথা ও ভাবতেই পারে না। আব তোমাদের এই আলাপের কথা ও তো জানে না। জানলে নিশ্চয়ই রাজী হতো না এ-বিয়েতে।

জানে না বলেই জানাতে চাই না।

সুরজিত তোমাকে ভালবেসেছিল, ভালবেসেছিল কিম্বা ভালবাসার ভানই করেছিল। কিন্তু বিয়ে করতে রাজী হয়নি, গীতাকে ও ভালবাসা না দিয়ে বিয়েই যদি করে শুধু ? তা ও পাবে।

উঁহু। গীতার মত মেয়েকে যে ছেলে ভালবাসতে না পারল, সে জেনো পৃথিবীর কাউকেই কোনদিন ভালবাসতে পারবে না।

এ তোমার বাড়িয়ে বলা।

বাড়িয়ে ? তাহলে তাই।

জানিনা বাবা, তোমার হালচাল। তোমার সঙ্গে কথায় পেরে উঠবে কে।

বৌদি হার মানলো। বৌদি বলতে চাইলেও, আমি বলতে দিইনি দাদাকে। নতুন ক'রে তাকে ঘেঁটে কিই আর হবে।

আর, এতোদিন সে গল্প শোনানো হয়নি যখন, আজই বা কেন? তবু এও জানি, বললে দাদা অবিশ্বাস করবে না। মিথ্যে কখনো বলিনি। একথা বাড়ীর সকলেই জানে। মিথ্যে কখনো বলব না, তাও সব্বাই জানে। কিন্তু ওদের জানাটাই বড় কথা নয়, বড় কথা আমার জানানো।

এগারো

কার চিঠিগো অতো মন দিয়ে পড়ছো ? অফিস থেকে ফিরে কোট খুলতে খুলতে জিগ্যেস করলো অমলেন্দু।

প্রেমপত্র।

কার, কোথাকার ছেলে, কি নাম ?

ছেলে নয়, মেয়ে।

তবু ভালো, বাঁচলাম। চেয়ারে এলিয়ে দিল নিজেকে অমলেন্দু।

বড্ড ভীতু তুমি।

তোমার মত আগুনকে নিয়ে ঘর করা ভয়েরই কথা বৈকি।

অসভ্যতা কোরো না। সীতার চিঠি।

ভারি চমৎকার চিঠি। খুব লিখতে পারে তোমার এই বন্ধুটি।

চমৎকার মন বলেই তো অমন চমৎকার লিখতে পারে। চিঠিটা মুড়ে রাখল বন্যা।

অমলেন্দু বলল, বোধ হয় তাই।

ওর জন্যে মাঝে মাঝে আমার এতো কষ্ট হয়। জানো, রূপ আর রং ভগবান দিতে পারেনি কিনা, তাই এছাড়া পৃথিবীতে আর যা কিছু ভালো আছে, তার সব কিছুতেই ওকে ভরিয়ে দিয়েছে।

সে তো নিশ্চয়ই।

সানাই বাজছে। খুশীর সানাই। তবু খুশীর সানাই এতো কান্না ঝরাচ্ছে কেন, কে জানে। বাড়ীর সকলের মধ্যে খুশীর সানাইএ কান্নার সুরের খোঁজ একমাত্র সীতাই কি পেলো শুধু ? কিন্তু এতো ও চায়নি। সানাইয়ের সুরে ওতো খুশীর আকাশই চেয়েছিল। উৎসবের রং লাগানো সারা বাড়ীটার মধ্যে একটা কোণের ঘরে একলা কি সীতা সানাইয়ের করুণ সুরই শুনতে বসলো ?

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক। খুশীব মিষ্টি সুর হঠাৎ অতর্কিতে এক ঝাঁকে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

ওমা তুই, কি মজা! খুশীতে উজ্জ্বল হ'য়ে ছোট্ট মেয়ের মতই হাততালি দিয়ে উঠলো যেন সীতা। তুই না লিখেছিলি আসতে পারবি না?

লিখেছিলাম তো। কিন্তু দেখলাম, আসা উচিত, তাই চলেই এলাম।

বেশ করেছিস, খুব ভালো করেছিস।

এখন তোর খবর টবর বল তো শুনি। কেমন আছিস।

ভালই।

কিন্তু শরীর দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। বেশ রোগা হয়ে গেছিস।

হয়েছে নাকি? রোগা হওয়াই তো ভাল। একে কালো কুচ্ছিত, তার ওপর মোটা। সোনায় সোহাগা। কেউ আর তা হ'লে বিয়েই করবে না।

বিয়ে করবার এখনো সখ আছে বুঝি?

আছে। বলে একটু জোর করে হাসতে গেল সীতা। হাসি একটুও ঝরলো না। তাব বদলে কোথা থেকে চোখ দুটোই জলে ভরে গেল।

ওমা কাঁদছিস তুই?

আমার কান্নার কথা ছেড়ে দে। জানিসতো তোর এই বন্ধুটি এক নম্বরের ছিঁচ্ কাঁদুনে আর বোকা।

আমি কিচ্ছু জানি না, আর জানতেও চাই না। শুধু জানি, তোর মতো বন্ধু হয় না।

দুর। তা ঠিক নয়। আসলে তুই নিজে খুব ভালো কিনা, তাই তোর সকলকেই ভালো লাগে।

তাই। হাসল বন্যা। তোর সেই অফিসের ছোকরাটির খবর কি?

ওর খবরও ভালো।

কথাটথা বলে তোর সঙ্গে ?

চেষ্টা করে। আগের চেয়েও বেশী। কথা বলা আমিই কমিয়ে দিয়েছি।

বেশ করেছিস। এবার কাছে এলে গালে ঠাস্ ক'রে খুব জোরে এক চড় মারবি যাতে ওখানে পাঁচটা অঙুলের দাগ পড়ে বুঝলি ?

রক্ষে কর। হেসে উঠল সীতা। ওসব আমি পারব না।

তা কেন পারবি, খালি বসে বসে কাঁদতে পারিস।

একটু চুপ ক'রে থেকে সীতা বললো, এই বন্যা, রাগ করেছিস ?

করব না ?

কিন্তু তুই তো জানিস, পাথরের বুকে যাদের বিশ্বাস করে আদরের আঁচড় কাটতে গিয়েছিলাম, তারা সকলেই বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে পাথর ফাটিয়েই দিয়ে গেছে।

তাতো জানি।

তারপর আবার অনেকক্ষণ একলা ঘরে বোবা হাওয়া। বিয়ে বাড়ীর হৈ হল্লার ঢেউ শুধু ক'রে গেল আনাগোনা।

বর কখন আসবেরে ? প্রশ্ন করল বন্যা।

সন্ধ্যেবেলায় তো শুনলাম।

লগ্ন কখন ?

রাত ন'টা কত মিনিটে যেন।

তাহলে বাসরে সারারাত বেশ মজা করা যাবে।

তোর তো সব তাতেই মজা। কি করবি শুনি ?

প্রথম রাতেই এমন ক্ষ্যাপাবো সুরজিতকে।

দোহাই তোর, বেফাঁস কিছু বলে বসিসনে যেন। তোকে তো কিছুই বিশ্বাস নেই।

দুর, তোর কোনো ভয় নেই। আর তুইতো সেখানে থাকবিই।

বাসরে থাকতে একটুও ইচ্ছে নেই আমার।

কেন ?

এ কেন'র কোনো জবাব নেই।

তোকে কিচ্ছু করতে হবে না, লক্ষ্মী মেয়ের মত আমার পাশে বসে থাকবি।

যদি লক্ষ্মী হয়ে বসে থাকতে না পারি ?

পারবি না কেন ? তুইওতো বড্ড শান্ত মেয়ে।

কিন্তু কেমন যেন ভয় ক'রে।

হয়ত এ ভয় মিথ্যে নয়। ওর দিকে তাকালো বন্যা। ছলছলে দুটো চোখ কান্নারই জলে যেন ভিজে। বলতে পারতো সীতাকে, তুইতো অন্তহীন রাতের সমুদ্রে শয্যা পেতেছিস্, একটা রাতের শিশিরে ভয়টা কিসের ? বলতে পারত। কিন্তু বলল না কিছুই। নামলো অন্য প্রসঙ্গেই।

হ্যাঁরে, এর মধ্যে আর দেখেছিস তুই সুরজিতকে ?

অনেকবার। কয়েকবার বাড়ীতেও এসেছিল।

কেমন চেহারা হয়েছে এখন ?

আরো ভালো।

তোর সঙ্গে কথা বলেছিলো ?

বলতে চেয়েছিল, আমি শুনতে চাইনি।

কি বলতে চায়, শুনলেই তো পারতিস।

যা বলে গেছে তার চেয়ে বিষাক্ত কিছু নিশ্চয়ই বলত না জানি। কিন্তু আমার আর ও-প্রসঙ্গ ভালো লাগতো না।

এখনও কি তোর সেই অবস্থাই ?

কি জানি, হয়ত তাই।

এতদিনেও যখন ভুলতে পারলি না, আর কোনোদিনই পারবি না।

না না, ও কথা বলিসনে। যাতে পারি সেই চেষ্টাই করব।

ভিজে ভিজে চোখ থেকে কয়েকটা ফোঁটা গাল বেয়ে নেমে এলো। কিন্তু নামতে দিল না সীতা। বুঝলো উৎসবের বাড়ীতে কান্নার এই ফোঁটার কোনো মানে হয় না। ওরা মমতাহীন এখানে।

পরশুই তুই চলে যাবি নাকি বন্যা ?

হ্যাঁ।

এই একটুখানির জন্যে আসবার কি দরকার ছিল ?

একটুখানিই তো ভালো। বেশী ছুটি পাওয়া গেল না।

তোর সাহেব খুব কড়া মনে হচ্ছে।

ভীষণ।   বেশী ছুটি চাইলেই চাকরি থেকে দূর করে দেবে।

দিকনা।   ওই তো ভুগবে।

চাকরি গেলে এখন আর কে চাকরি দেবে বল? বয়েস তো. বুড়িয়ে গেছে।

আচ্ছা এতদিন যে মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট হয়ে চাকরি করে গেল, খুশী হয়নি সায়েব?

খুব।

বারো

কাণায় কাণায় জোয়ার-জাগানো যৌবন দেহের বক্র রেখায় বেনারসী শাড়ীটা আলিঙ্গনের ঢেউ দিয়ে উঠেছে। প্রশস্ত কপালের চারপাশে চন্দনের ফোঁটা যেন মুক্তোরই ফোঁটা। একরাশ কালো চুলের বন্ধনে কালো আকাশের অজস্রতা। মস্ত একটা মোটা মালা, এক গুচ্ছ গোলাপ আর গাঁদার চুমু নিয়ে গলা থেকে উদ্ধত বুকের ওপর লুটোচ্ছে। এক কোণে মেয়েদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওকে অবাক হয়ে দেখল সীতা অনেকক্ষণ। অদ্ভুত ভালো দেখাচ্ছে রোজকার দেখা গীতাকে। বিয়ের আগের এই মুহূর্তগুলোতে সব মেয়েই কি এমনি অপরূপ হয়ে ওঠে? কে জানে। কুমারী জীবন থেকে বিদায় নেবার আগে সে-জীবনের সমস্ত সম্পদ কি এমনি করেই সারা দেহের লোভনীয় খাঁজে খাঁজে জোয়ারের মত জড়িয়ে যায়? তবুও অনেক মেয়ের ভিড়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে গীতার দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হ'ল, সেও যদি ওর মত সুন্দরী হ'ত! এমনি মনে হওয়া হয়ত এই প্রথমই। কই, বন্যার দিকে তাকিয়ে এমনি কখনো মনে হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। তবে এ কি হিংসে? এ কি লোভ? না, শুধু নির্দোষ একটু চাওয়া? বুঝতে কিছুই পারলো না সীতা।

এক সময় হাতছানি দিয়ে ডাকল গীতা, দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল সীতা।

কি রে?

কোথায় তুই সারাদিন ঘুরছিস মেজদি? দেখতেই পাচ্ছি না।

বারে কাজ করছি। কত কাজ জানিস বিয়ে বাড়ীতে?

কাজ না ছাই। বসতো তুই আমার পাশে। একলা-একলা একটুও ভাল লাগছে না।

একলা কোথায়? কত তো লোক রয়েছে।

তা হ'ক। বস তুই আমার পাশে। তুই না থাকলে বড্ড একলা মনে হয়।

কি ছেলেমানুষ তুই! হেসে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল সীতা। তারপর বলল, ইন্দ্রদার কথা তোর মনে পড়ে?

হ্যাঁ। ঘাড় নাড়ল গীতা। হ্যাঁরে, ইন্দ্র দা এখনো এলো না?

চিঠি এসেছে একটু আগে। আজে-বাজে কি সব লিখেছে। আর লিখেছে আসা সম্ভব হ'ল না। গীতা যেন কিছু মনে না ক'রে।

সম্ভব হল না! মিথ্যে কথা। আসুক একবার, এমন ঝগড়া করবো।

তোর জন্যে ভারি চমৎকার একটা উপহার পাঠিয়েছে ইন্দ্রদা।

ওমা, দুই বোনে এখানে দিব্যি আড্ডা দেওয়া হচ্ছে। আমি এদিকে সারা বাড়ী খুঁজে খুঁজে হয়রান। বন্যা ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠলো।

কি করব বল, সীতা জবাব দিল, জোর করেই বসিয়ে রেখেছে গীতা। ওর নাকি একটুও ভালো লাগছে না একা থাকতে।

একা আবার কোথায়, বিয়ে বাড়ীর কত লোক।

তা হ'ক। বাইরের লোকের কাছে যতই বড় হোক, আমাদের কাছে গীতা সেই ছোট্টটিই রয়ে গেছে।

ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল সীতা। অনেক দিন পরে মেজদির বুকের মধ্যে আবার মুখ লুকালো গীতা।

দুই বোনের আদর দেখতে দেখতে বন্যা হঠাৎ পাকড়াও করল ওদের বৌদিকে।

ছাড়োগো মেয়ে কত কাজ বাকী রয়েছে।

বৌদি ডিয়ার, বড্ড বেশী কাজ করছ তুমি।

বারে, কাজের বাড়ীতে কাজ করতে হবে না?

সব্বাই কাজ করলে, আমি কি করব? কত কষ্টে ছুটি নিয়ে এলাম ক'টা দিন আড্ডা মারব বলে, কিন্তু কোথায় কি? বললে বন্যা।

তুমিও অফিসে ঢুকেছো নাকি? বৌদি অবাক হ'ল।

সীতা তো হেসেই অস্থির। তুমি এক নম্বরের বোকা বৌদি। কিচ্ছু বোঝো না। অন্য অফিস হতে যাবে কেন, ও হ'ল ওর কর্তার অফিস।

ও হরি, তাই বল। তা দু'বন্ধুতে সেই সকাল থেকে তো জাবড় কাটলে, তবু আড্ডার নেশা গেল না?

হাসল বন্যা। ও যে সর্বনেশে নেশা ও কি যাবার। বসে যাও এখানের আসরে।

রক্ষে কর। তোমার দাদা বর আনতে অনেকক্ষণ চলে গেছে। এই এলো বলে। এখন কি আড্ডা দেবার সময়! এক রকম দৌড়েই পালালো বৌদি।

তারপর কে যেন খবর দিল বর আসছে। খবরটা হাওয়ার মতই সারা উৎসবের বাড়ীটায় ছড়িয়ে পড়ল। সবাই সব কাজ ফেলে হুড়মুড় করেই ছুটে গেল দরজা আর জানালায়। ফুল দিয়ে সাজানো মস্ত একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো ফটকের কাছে। সানাইয়ের সুরে আবার শুরু হ'ল সুর-ঝরা খুশীর। শুধু এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল সীতাই।

মেজদি! হঠাৎ চমক ভাঙল সীতাব ডাকে।

কিরে?

তুই বর দেখতে গেলি না?

ওতো দেখা লোক, ওকে আবার দেখব কি?

তোব মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তোর খুব কষ্ট হচ্ছে। না মেজদি?

তুই চলে যাবি, হবে না?

আমার কিন্তু তোর জন্যে কষ্ট হচ্ছে মেজদি। বার বার মনে হচ্ছে, এ আমি খুব খারাপই করলাম।

খারাপ আবার কি করলি?

ভীষণ ভয়ই হয়েছিল সীতার। হয়ত কোনোরকমে খোঁজ পেয়েছে সীতা ওর আর সুরজিতের পুরোনো অন্তরঙ্গতার অসফল কাহিনীর। অস্থির চাঞ্চল্যে উঁচু বুকের ওঠানামা দ্রুত থেকে দ্রুততরই হ'ল। তারপর জবাব শুনে আশ্বস্ত হ'ল।

তোর বিয়ে করবার আগে আমার বিয়ে করা ঠিক হ'ল না।

ও, এই কথা। আমি তো বলেই দিয়েছি বিয়ে করব না।

কিন্তু কেন?

তোর বিয়ে হ'লে আমারও হ'লরে, তোর ঘর বাধা হ'লে আমারও হ'ল। তোদের সাজানো সুন্দর সংসারে তোর আদরের মেজদির ছোট্ট একটু জায়গা হবে না বলতে চাস? ওর চন্দন-রাঙানো কপালে ঠাণ্ডা হাতের আদর দিল সীতা।

ততক্ষণে এসে পড়েছে বন্যা। আবার কি কনস্পিরেসি হচ্ছে দু'বোনে?

সুখ-দুঃখের দুটো গল্প করছি। বললে সীতা।

তেরো

তারপর বাসর। বন্যা একাই মাত করলো। বৌদি বলে গেল, বন্যা যখন এসে গেছে, আর ভাবনা নেই। সত্যিই তাই। অফুরন্ত হাসতে আর ক্লান্তহীন বক্‌বক্‌ করতে ওর জুড়ি নেই।

গীতা ধমক দিল, চুপ কর দিকি।

বন্যা হেসে উঠল, তার চেয়ে বলনা বিষ খেতে।

এখন তোর বিয়ে হয়েছে, আর কচি খুকীটি নোস। লক্ষ্মী হয়ে বসতো।

সুরজিত বলল, লক্ষ্মীছাড়া হবার এইতো সময় মেয়েদের।

বন্যা জবাব দিল, তাহ'লে তুমি মনের মত বউই পেয়েছো। এখন তো দেখছো কি শান্ত হয়েই না বসে রয়েছে, কিন্তু আসল চেহারা দু'চার দিন পরেই টের পাবে।

কিরকম চেহারা জানলে ভালো হ'ত। মারধোর ক'রে নাকি?

তা একটু-আধটু। না না, ভয়ের কিছু নেই তেমন।

হাসি চাপবার অনেক চেষ্টা করেও পারল না গীতা।

ভয় নেই বলছ, কিন্তু দেখছি ভয়েরই ব্যাপার। বললে সুরজিত।

সে তোমরা প্র্যাক্টি করে নিও। এখন এদিকে শোনো। একে চেনো কি? এ হচ্ছে কনের মেজো বোন।

চিনি বৈকি। হাসল সুরজিত।

চিনলে কি ক'রে? বিয়ের আগে তো বউয়ের মেজদিকে চেনার কথা নয়।

না না, মানে আগেও তো কতবার এ-বাড়ীতে আসা-যাওয়া করেছি। তাতেই চেনা-জানা হয়েছে আর কি।

আর কিছু নয়তো?

আর কি আবার।

এই ইয়ে-টিয়ে কিছু। আজকালকার ছেলেদের ওপর ভরসা তো কিছুই নেই।

রসিকতায় বাসরের মেয়ের দল খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। হাসল না শুধু এপাশে সীতা আর ওপাশে সুরজিত। সীতা তো হাসলই না, সুরজিত হাসতে চাইল, কিন্তু পারল না। এতক্ষণের খুশীভরা মুখটা হঠাৎ যেন খুশীহারা কান্নায় বর্ণহীন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। জবাব দিতে দেরীই হ'ল সুরজিতের। তার আগেই ধমকে উঠল সীতা। তোর মুখে কি কিছুই আটকায় না মুখপুড়ী মেয়ে? ভারি অসভ্য হয়েছিস তুই।

বন্যা হাসল ওর রাগ দেখে। কি করব বল, বাসরে বসলে ভদ্র কথা মুখে আসতে চায় না।

আসেনা তো চুপ করে থাক।

চুপই করলো বন্যা। কিন্তু ও-মেয়ে কতক্ষণ চুপ ক'রে থাকতে পারে? অনেকক্ষণ পরে বাসরের বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সীতা বলল, কি একটা কাণ্ড ক'রে এলি বলতো? তোকে নিয়েই আমার যত ভয় হতভাগা মেয়ে।

ভয় তো প্রেম করতে গিয়েছিলি কেন?

চুপ কর দেখি। সে-প্রেমের আজ কোনো দাম নেই। বাজে কথা বলতে কে বলেছে?

বাজে কথা আবার কিসের?

নয়? কি ভাবল বলতো সীতা?

কিচ্ছু না। এতো শুধু মজা। সবার সঙ্গে সেও তো হেসেছে। যা বললাম, তাতো ঠাট্টা। সত্যি সত্যি আর কে ভেবেছে।

যদি কেউ বুঝে থাকে?

রেখে দে। অতো বুদ্ধি থাকলে সে আর সাধারণ মানুষ থাকত না, অমানুষই হয়ে যেতো।

আর তোর ঠাট্টার চোটে আমার বুকটা ধড়াস-ধড়াস করে উঠেছে।

এইরকম ঠাট্টাই তো ভালো।

তোর সব কিছুই বিদঘুটে। সুরজিত কি ভাবল বলতো?

ভাবলই শুধু নয় বোকা, জানলও।

কি?

ফুলেতে মধুই শুধু নেই, কাঁটাও দিব্যি আছে।

চোদ্দো

বন্যা, বিকেলের গাড়ীতে তুই চলে গেলি আর সন্ধ্যের দিকে চলে গেল সুরজিত আর গীতাও। তারপর থেকেই সব কিছু কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। ক'দিনের বিয়ে বাড়ীর হৈ-হুল্লা আর হট্টগোল হঠাৎই থেমে গেলো। এমনিই তো হয়। অবশ্য আমরা আর কি ভাগ নিয়েছি এই হৈ-হুল্লা আর হট্টগোলের? দু'জনে মিলে ক'টা দিন তো আড্ডাই মেরেছি। অবশ্য গীতার স্বামীর ঘর করতে যাওয়া মানে দূর কোথাও নয়, এই শহরেই। যখন ইচ্ছে ডাকা যাবে ওকে, যখন খুশী দেখা যাবে ওকে, তবুও যাবার সময় সকলের চোখই ছলছল ক'রে উঠল। মা তো হাউ হাউ করে কেঁদেই উঠল। এই যাবার সময়টা ভারি বিশ্রী লাগে। এর আগে দিদির সময়েও এমনি ছলছল চোখ হয়েছিল সকলের। তবু এই বিদায়-দৃশ্যের দর্শকই হয়েছি শুধু। বিদায় দিয়েছি দিদিকে বিদায় দিলাম গীতাকে। বিদায়ই দিয়ে গেলাম শুধু, নেবার কি জ্বালা কোনোদিনই জানলাম না। জানবও না কোনোদিন।

গীতা এসে প্রণাম করল। বলল, চললাম মেজদি।

হেসে বুকে জড়িয়ে বললাম, বিয়ে হতে না হতেই খুব সভ্য হয়েছিস দেখছি। একেবারে এত বড় প্রণাম করে ফেললি?

ও হেসে ফেললো, বারে তুমি গুরুজন যে।

এতদিন তো মেজদির কথা শোনাই হত না। খালি ঝগড়াই তো করতিস।

দুর, কি যে বলিস।

ও আমার বুকে মুখ লুকোলো। হয়ত লজ্জা ঢাকতেই।

এর মধ্যে সুরজিত এসে দাঁড়িয়েছে। বললো, আমারও তা হ'লে একটা প্রণাম করা দরকার। বিয়ের পর আমার সঙ্গে নিজের থেকে এই ওর প্রথম কথা। জবাব দিতে গিয়ে থামলাম একটু। ভয়েই। আপনি না তুমি বলব ঠিক করে উঠতে

পারলাম না। আপনি-তুমির ঝগড়া থেকে শেষে সরিয়ে নিলাম দুটোকেই।

বারে, প্রণাম আবার কি জন্যে ?

সম্বোধনটা এড়িয়ে গেল সুরজিতও। জবাব দিল, গীতার গুরুজন যখন আমারো তো হওয়া উচিত।

কে বললে ? মোটেই নয়।

সুরজিত জানে তো ওর চেয়ে বয়েসে ছোটোই আমি। জানে না কি ? তবে এ প্রসঙ্গ কেন ? রাগই হ'ল। হাতে হাত দিয়ে আশ মেটেনি, তাই কি পা ধরতে চায় ? এ কি শুধু এমনিই চাওয়া একটা, না অন্য কোনো মতলব আছে ওর ? কে জানে। তাড়াতাড়ি সরে এলাম সেখান থেকে। চলে এলাম নিজের ঘরে।

তারপর যাবার সময় আমার ঘরের দরজার সামনে হঠাৎ কি ভেবে দাঁড়াল সুরজিত। আমি অবাক হবার আগেই বলে উঠল, ছোটো তো জানি, বড় হতে কখনো কি ইচ্ছে করে না ? বলে দাঁড়াল না আর। আমি জবাব দেবার আগেই চলে গেল। জবাব শুনতে চায় না হয়ত। আর শুনতে চাইবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকলেও, দিতে কিছু পারতামও না হয়ত। সিঁড়ি দিয়ে তর তর ক'রে নেমে গেল ও। সিঁড়িতে শব্দ পেলাম। বেরলাম না ঘর থেকে। জানালার কাছে এসেই দাঁড়ালাম। ওখান থেকেই দেখলাম, সুরজিত আর গীতা মটরে উঠলো। দাদা বসলো সামনের সীটে। মা বাবা, কুণাল আর নীতা ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে। আমি ওপর থেকেই দেখলাম। মটর ছাড়ল। একলা ঘরে অনেকক্ষণ সুরজিতের শেষ কথাগুলোই ভাবলাম। ছোটো তো জানি, বড় হতে কখনো কি ইচ্ছে করে না ? কেন জানতে চাইল কে জানে। আমাকে বড়র আসনে বসিয়ে কি পাবে সুরজিত ? না, এ কি শুধু নতুন ক'রে অপমানই ?

তোর কাছে বলতে লজ্জা নেই বন্যা, সুরজিতকে দেখলাম সেই বিয়ের রাতে। সেই বাসরে অনেক দিনের পর। অনেক দিনের পর আবার ওকে দেখে বেশ ভালই লাগল। অনেকদিন আগে তোকে যা প্রশ্ন করেছিলাম বন্যা, আজ আবার সেই কথাই বলব।

বলব, আমি কালো কুৎসিত হ'তে পারি, তাই বলে আমার চোখ তো কালো নয়। যা ভালো, তাকে ভালো লাগার চোখ কালো মেয়েরও তো আছে। কালো কুৎসিত বলে ভালো লাগার চোখও কি কালো কুৎসিত হবে? এ প্রতিজ্ঞা কোনো কালো মেয়েই তো করেনি। আর এই অনুরাগের চোখ নিয়ে জীবনে প্রথম ভালো লাগল, জীবনে প্রথম ভালবাসলাম সুরজিতকেই তো। তবু শেষ পর্যন্ত কান্নাই দিয়ে গেল ও। কালো হয়ে আর মেয়ে হয়ে জন্মাবার অভিশাপের কান্না, নির্যাতনের কান্না। ভেবেছিলাম ওকে ঘৃণাই ক'রে যাব সারা জীবন। প্রতিজ্ঞাও করেছিলাম। কিন্তু পারলাম না। এ হয়ত আমার মনেরই দুর্বলতা। তবু কান্না যতই দিক, সুরজিতের কাছে কিছু কৃতজ্ঞতাও যে জমা হয়ে রয়েছে। তা ভুলব কি করে বল? তার দামও তো কম নয়। জীবনের দুঃসহ জোয়ার জাগার প্রথম প্রহরে অনুরাগের প্রথম পুরুষ ও। একটু কথাতে, একটু হাসিতে, একটু কাছে বসায়, একটু ছোঁয়ায় যা দিল ও, কেউ কখনো দেয়নি আগে। শিরশিরিয়ে ওঠা দেহের আবেগে যে খোঁজ দিল পুলকের, খবর দিল দুঃসহ অনুভূতির, তার দান তো কম নয়। তাই সুরজিতকে ঘৃণা করতে গিয়েই মনে পড়ল ওর জন্যে জমানো কৃতজ্ঞতাকে। কান্নাই কি দিয়েছে শুধু ও?

এতক্ষণ নিজের কথাই সব বকে গেলুম। কেমন আছিস তুই? অমলেন্দু কেমন আছে? বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেলি তুই। এতো কম সময়ের জন্যে কেউ আসে কি। এবার খুব বেশী দিনের ছুটি নিয়ে আসবি, কেমন? হুট্ ক'রে এলে হুট্ করে পালালে আর তোকে চিঠিই লিখব না। বুঝবি তখন মজা।

পনেরো

শ্বশুরবাড়ীতো নয়, মামারবাড়ীই যেন গীতার। যখন ইচ্ছে হুট্ ক'রে এসে পড়ে। একই শহরের এ-কোণ ও-কোণ। কিইবা দুর।

সীতা ডাকল, শোন। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে কেমন লাগছে?

বেশ ভালই।

আর বরটি?

ও-ওতো খুব ভালো। হুঁ, তার মানে এখন থেকেই আমরা সব পর হয়ে গেলাম।

দুর। ওর গলা জড়িয়ে ধরল গীতা। তোরা কেউ পব হবি না। তুই তো কক্ষনো নোস মেজদি।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু প্রিয় হতে প্রিয়তব এখন একজন এসেছে যে।

লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো গীতা।

গীতাকে ডেকে গল্প শুনি। সুরজিতের। কি-কথা হ'ল, কি-কথা হয়নি, সবই ডেকে ডেকে জিগ্যেস করি ওকে। ওদের ভালবাসার গল্প শুনি, গল্প শুনি ওদের ভালো-লাগাব। বলতে ওব ভালই লাগে, আর শুনতে আমারও। তবু শুনতে শুনতে এক একদিন মন উদাস হযে ওঠে। বুকের মধ্যে অসহ্য একটা কান্না গুমরে ওঠে। চীৎকার ক'বে উঠি, থামতো।

অবাক হয় গীতা। কি হ'ল মেজদি?

না না, কিচ্ছু নয়। বলে যা না তুই।

না থাক। শুনতে তোব ভালো লাগছে না।

ওর কাছে ধরা পড়তে কেমন লজ্জা করে। ভাবি চীৎকার করব না। চুপ করে শুনে যাব। পারি না। অসহ্য এক কান্না'র ঢেউ গলাটা চেপে ধরে। ভাল লাগছে না শুনতে, বুঝতে পারে গীতা। কিন্তু কেন লাগছে না, তা বুঝতে ও কোনোদিনই পারবে না হয়ত। কোনোদিনই না পারে যেন।

তবু শুনি আমি। কেন, কে জানে। যাকে চেয়েছিলাম, পাইনি, তাকে যে পেলো কি আশ্বাসে কি অনুরাগে পেলো, তারই খোঁজ নেবার দুরন্ত-স্বাভাবিক আগ্রহই হয়ত। তার বেশী আর কিছু নয়।

তোমার ওপর ওর খুব ভক্তি, জানো মেজদি।

কি রকম ?

বলছিল, তোমার মেজদির মত অতো ভালো মেয়ে আমি তো দেখিনি।

তা তুই কি বললি ?

আমি বললাম, সত্যিই। বললাম, জানো মেজদি আমার দেখতে ভালো নয়, রঙও কালো—তবু নির্মম নিষ্করুণ মানুষের অবজ্ঞা আর উপহাসের সামনে যেভাবে ও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তার তুলনা হয় না।

বলিস কি, এতো কথা বললি তুই ?

নিশ্চয়ই। আর বলবই বা না কেন, মিথ্যে তো নয়।

তা ও কি বললে ?

বলবে আবার কি ? আছে কিছু বলবার ?

মিথ্যে রে বন্যা, সব মিথ্যে। ওরা ছেলেরা শুধু বড় কথাতেই মন ভেজাতে চায় মেয়েদের। কথা, শুধু কথাই। মনে মমতার একটুও স্পর্শ নেই সেখানে। আমাকে ভালো বলে ও গীতারও মন ভেজাতে চায়। ওকে আমি চিনি। এমনি ভালো ভালো কথা সেদিনও ও বলেছে অনেক। কিন্তু আশ্চর্য কি জানিস, বাড়িয়ে বলা জেনেও ছেলেদের মুখের আদর-মাখানো কথা শুনতে অদ্ভুত ভালো লাগে মেয়েদের।

তোর চিঠি পেয়েছি বন্যা। দুদিন হ'ল এ-বাড়ীতে এসেছে সুরজিত আর গীতা দুজনেই। হপ্তাখানেক থাকবে ওরা।

কাল গীতা ঘরে ঢুকে বললো, মেজদি, আজ সিনেমা প্রোগ্রাম।

বই পড়ছিলাম। বইটা মুড়ে বললাম, বেশ তো।

বেশ তো নয়। ওঠো তাড়াতাড়ি। রেডি হয়ে নাও।

আমি কেন রেডি হব ?

বারে, তুমিও ওই প্রোগ্রামে আছো যে। আমি, তুমি আর ও।

ওদের সঙ্গে যাবার একটুও ইচ্ছে ছিল না। বললাম, আমি না হয় বাদই গেলাম।

উঁহু, তা হয় না।

এমন সময় ঘরে এলো সুরজিত। কি ব্যাপার গো ? জিগ্যেস করল গীতাকে। কি বলে তোমার মেজদি ?

মেজদি যাবে না বলছে।

সে কি, কেন ? আমার দিকে তাকালো সুরজিত।

এই, মানে, সিনেমা-টিনেমার আমি তেমন ভক্ত নই। গীতা জানে।

ভক্তি না থাক, একদিন দেখলে কিচ্ছু হবে না।

তাছাড়া......

তাছাড়া কি ?

মিথ্যেই বললাম, শরীরটা তেমন আমার ভাল নেই।

দেখি কি হয়েছে শরীরের। কাছে সরে এসে কপালে আমার হাত রাখল সুরজিত। ওই একটু ছোঁয়ায় সারাটা শরীর আমার শিরশিরিয়ে উঠলো। বুকটা যেন আবেগে মোচড় দিয়ে উঠল। কপাল থেকে হাত সরিয়ে বলল, দূর, কিচ্ছু হয়নি। তারপর আমার একটা হাত ধরে টেনে তুলল বিছানা থেকে। নাও, তৈরি হয়ে নাও, তাড়াতাড়ি। কুইক্।

সিনেমায় সারাক্ষণ ওরা কথা বলল। আমি চুপ করে রইলাম। ওদের হাসি-গানের দুরন্ত জলসায় আমি বোবা দর্শক। শুনতে হয় শুনছি, দেখতে হয়, দেখছি। হাততালি দিতে পারছি না। ওদের খুশীর বাসরে আমি এক কোণে বসা নীরব শ্রোতা। হঠাৎ যেন নজর পড়ল সুরজিতের। বলল গীতাকে, তোমার মেজদি কিন্তু বড় গম্ভীর।

মেজদি চিরকালই কম কথা বলে।

কিন্তু আমরা যে এখানে রসালাপ করতেই এসেছি।

কথা বলনা তোমরা, বেশ তো শুনছি আমি।

শুনলে হবে না। তোমাকেও কথা বলতে হবে। গীতা জানাল।

হাসলাম, কি কথা বলব ?

সুরজিত বলল, যা ইচ্ছে, যা খুশী।

তারপর বাড়ী ফিরে অনেকক্ষণ ঘুম এলো না রাতে। একলা বিছানায় বসে বই পড়লাম চুপ করে। বই-ও ভালো লাগলো না। আলোটা নিভিয়ে দিলাম। এক ঝাঁক চাঁদের আলো জানালা বেয়ে ঘরে ঢুকল। অনেকদিন চাঁদ দেখিনি। চাঁদ দেখতে জানালার কাছে দাঁড়ালাম। হঠাৎ কানে এলো হাসি আর কথার ছিটিয়ে-পড়া ঝিকিমিকি টুকরো। ওরা দুজন গল্প করছে। ইচ্ছে করল না গল্প শোনবার। পাশেই তো ওদের ঘর। এখনো তাহলে ঘুমোয় নি ওরা। দু'জনে মিলে চাঁদের রাতের প্রহর জাগছে। জানালায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ চোখ পড়ল কোণের বারান্দায়। ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে ওখানে দাঁড়িয়েছে চাঁদ দেখতে। সরে আসতে চেষ্টা করলাম জানালা থেকে। পারলাম না। ওদের দিকেই তাকিয়ে রইলাম। বারান্দায় লতাপাতায় লাল ফুলের ঝাঁক। ঝিরঝিরে হাওয়ায় চাঁদের ছায়া নড়ছে দেয়ালে। লাল ফুলের একরাশ ঝাঁকের মধ্যে ওরা দুজন আলিঙ্গনে ঘন হয়ে রয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকতে কিছুতেই পারলাম না। ছুটে সরে এলাম জানালা থেকে। বন্ধ করে দিলাম জানালাটা। আলো জ্বাললাম। আয়নাতে ছায়া পড়ল। আয়নার সামনে এসে নিজের দিকে একবার তাকালাম। নিজের মুখ নিজেই দেখলাম অনেকক্ষণ ধ'রে। মনে পড়লো অনেক কথাই। যে সোহাগ, অনুরাগ গীতা পেলো, তাতো আমিও পেতে পারতাম সুরজিতের কাছ থেকে, গীতার পাবার অনেক আগেই। কালো রঙটাই আমাকে ঠেলে দিল পাশে। সরিয়ে দিল কোণে। রূপ নেই বলে কি কিছুই নেই ? এই রকম গড়নই বা কটা মেয়ের থাকে ? গীতারও তো নেই। এতো নিয়েও কেন আমি পেলাম না মন যাকে চাইলো তাকে ? কোন মমতাময় বিচারকের এই মমতাহীন বিচার ? আয়নার সামনে সারা রাত নিজেকে দেখলাম আর সারা রাত কাঁদলাম। কালকের রাতে সে যে আমার কি হ'ল বন্যা। এমন পাগলানি

জীবনে কোনদিন তো করিনি। ঘুম-না-আসা রাত, এর আগে অনেক কেটেছে। কিন্তু কোনো রাতে এর আগে কখনো অস্থিরতা বোধ করিনি। নিজের সারাটা যৌবন দেহকে অনাবৃত ক'রে এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে- এর আগে কখনো দেখিনি। দেখিনি জমাট ভরা বুকে, ফোলা গালে, ঠোঁটে আর কপালে, কৃষ্ণকলির প্রতিটি শিহরিত খাঁজে খাঁজে কি আছে, কি নেই। ছেলের লোভী চোখ দিয়ে নিজের লোভী যৌবন দেহকে হাতড়ে বেরালাম সারাটা রাত। পাগলামিই হয়তবে বন্যা, পাগলামিই। নিজেকে এভাবে খুঁজতে খুঁজতে মনে হ'ল, মনে হ'ল জীবনে এই প্রথম, গীতার চেয়ে বড় শত্রু আর আমার কেউ নেই।

পরের দিনের সকালটা সমস্ত রাতের গ্লানিকে ঝরিয়ে দেবারই দুঃসহ তপস্যা নিল। পারল কই? ঝিরঝিরে হাওয়ার এমন ভিজে ভিজে কান্নার ভোর এর আগে সীতার জীবনে কখনো আসেনি তো। কালকের সারা রাতের অসহ্য উন্মাদনা কোথা থেকে যে ভেসে এলো খুঁজে খুঁজে তার কোনো ঠিকানা পেলোনা সীতা।

জানালায় চিকচিক্ করছে রোদ। গীতা দাঁড়াল এসে।

এই মেজদি ওঠ। কত বেলা অবধি ঘুমোচ্ছিস?

চা হয়েছে? বিছানা থেকেই জিগ্যেস করল সীতা।

অনেকক্ষণ।

ওমা, তাই নাকি? ধড়মড় করে উঠে বসল সীতা। দরজা ঠেলে বাইরে এলো। তারপর চায়ের টেবিলে গীতার দিকে বারবার তাকাতে লাগল। খুঁজতে লাগল, কাল রাতের দুঃসহ পাওয়ার দুরন্ত শিহরণের কোনো খুশীর শিশির ওর কোথাও চিকচিক্ করছে কিনা। এ আজকাল ওর কি হয়েছে কে জানে। মনের এমন লাইন ছাড়া ক্ষ্যাপা ঘোড়ার ঘোড় দৌড় এর আগে কখনো দেখা যায়নি। লাগাম টানতে গিয়ে বারবার পিছলেই যাচ্ছে সীতার শক্ত হাত। এলোমেলো উদাস হাওয়ায় সব কিছু শিরশিরিয়ে দেবার ক্ষ্যাপা প্রহর এমনি মাঝে মাঝে মনের বাগানে আসে কি?

কাল রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো? সুরজিত জানতে চ'ইল।

এ জানতে চাওয়ায় হঠাৎ চমকেই উঠল সীতা। কাল রাতের কথা কেন? কালকের ঘুম না পাওয়া রাত কি অস্বস্তিতে কেটেছে, তার খোঁজ পেয়েছে কি সুরজিত? না, অসম্ভব। কি ক'রে পাবে? রাতের দুরন্ত মন কি কাউকে না পেয়ে তার চোখেতেই কি কামনার বিষাক্ত চিহ্ন রেখে গেছে? হয়ত। হয়ত নয়। তবু ওই চিহ্ন থেকে বিষন্ন কোনো গানের স্বরলিপি খুঁজে পাওয়া সম্ভব তো নয়। তবে এ-প্রশ্ন শুধু এমনিই। বলতে হয়, তাই বলবার কিছু।

হ্যাঁ, সীতা বলল।

কাল রাতে অনেকক্ষণ ঘরে আলো জ্বলছিলো কিনা, তাই বললাম।

আলো জ্বলছিলো মানেই বুঝবে বই পড়ছিল মেজদি। গীতা জানাল।

বাবা, খুব বই পড়তো।

পড়ে মানে? দাদা চুমুক দিল চায়ে। যাকে বলে বইয়ের পোকা।

খুব ভালো অভ্যেস, ভেরি গুড্।

কিচ্ছুই শোনে নি সীতা। তাকিয়ে ছিল গীতারই দিকে। একরাশ কোঁকড়ানো নরম কালো চুলের মধ্যে লাল সিঁথির দাগ। রোজই তো থাকে। আজ সকালে হঠাৎ মনে হ'ল লাল রঙ বড্ড বেশীই জ্বলজ্বল করছে। কেন কে জানে। যদি কেউ দিত ওর কালো রঙে একটু সাদার পরশ, কুৎসিত চেহারায় একটু সুন্দরের ফোঁটা। না না, সব এ মিথ্যে। চেয়ার ঠেলে চায়ের টেবিল থেকে বেরিয়ে এল সীতা। সহ্য যেন ও কাউকেই করতে পারছে না।

তারপর কাজের ভিড়ে সারাটা দুপুর অফিসে ও সব ভুলতেই চেষ্টা করলো। মাথার ওপরে একটানা ঘোরা ফ্যানের হাওয়ায় মনের জমানো ভিজে ভিজে সব শিহরণ উড়িয়ে দেবারই চেষ্টা করল। চেষ্টা করল ঘড়ির ছোট্ট সেকেণ্ডের কাঁটার সঙ্গে উদ্ধত বুকের ওঠানামার পদধ্বনি মিলিয়ে নিতে। তিন তলার জানালা

থেকে অনেক কাছের আকাশের দিকে চেয়ে চেষ্টা করল মনের রুদ্ধ আবেগের ছটফটানি অন্তহীন প্রশান্ত উদারতায় ঝরিয়ে দিতে। কিন্তু পারল কই ?

তাই রাতে যখন আধ-ভেজানো দরজাটা ঠেলে হঠাৎ সুবজিত ওর ঘরে ঢুকল, চমকেই উঠল সীতা। দেওয়ালে এলার্ম ঘড়ি টিক্ টিক্ করছে। বেশী রাত নয়। ন'টা পনের। গীতা মা-র সঙ্গে কি সব কেনা-কাটা করতে গেছে। ওকেও সঙ্গী করতে চেয়েছিল। যেতে রাজী হয়নি সীতা। মনটা আজকাল যেন ক্রমশ উদাস আর স্বার্থপব হয়ে উঠেছে। কারো সঙ্গই ভালো লাগে না। বই-ই পড়ছিল সীতা। কখন বেড়িযে ফিরেছে সুরজিত, ঘরে ঢুকেছে, আলো জ্বেলেছে তার কিছুরই খোঁজ পায়নি সীতা। পাওয়া অবশ্য উচিতই ছিল। এখান থেকে ও ঘবের জানালার আলো তো দেখা যায়।

তবু চমকেই উঠল সীতা সুবজিতকে ঘরে ঢুকতে দেখে। তাব ঘরে যখন ইচ্ছে আসবাব, কথা বলবাব, এমনকি হাত ধরবারও অধিকার এখন হযেছে সুরজিতের। যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাতে ওর আর সুবজিতের মনেব মিতালি কাছে না আসুক মনের বাইরে পৃথিবীব কাছে প্রীতিব মিতালি অনেক কাছেই এসেছে। গীতা এ চাক বা না চাক।

আধ-ভেজানো দবজাটা সামান্য ঠেলে একটু দাঁড়াল সুবজিত।

আসব ?

বা বে, এসো না।

দু'পা এগোলো আরো। ডিষ্টার্ব কবলাম না তো ?

ডিষ্টার্ব আবার কিসের ? বইটা মুড়ে রাখল সীতা।

খুব মন দিয়ে বই পড়ছিলে কিনা। চেয়াবটা টেনে বসল সুবজিত।

আর কোথাও মন দেবার ছিল না বলে বই-এ মন দিয়েছিলাম।

ও। মৃদু হাসল সুরজিত। তা এবা সব কোথায় ?

এরা মানে গীতা তো ? মা-র সঙ্গে মার্কেটিং-এ বেরিয়েছে। অনেকক্ষণ তো বেরিয়েছে, এবার হয়ত ফিরবে।

সারা মার্কেটটাই উঠিয়ে আনছে দেখছি। বললো সুরজিত।

তাইতো মনে হচ্ছে। হাসল সীতা।

দেখি ওপরের সব ঘরগুলোই অন্ধকার। আলো জ্বেলে একলা বসেই ছিলাম। হঠাৎ তোমার ঘরে আলো দেখে বাঁচলাম। সোজা চলে এলাম।

বেশ করেছো।

তারপর দু'পক্ষই কিছুক্ষণ চুপচাপ। শুধু টেবিল থেকে এলার্ম ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ এগিয়ে চলে। কি বই পড়ছিলে ওটা, দেখি?

ও কিছু নয়।

আহা, দেখিই না।

না। বইটা পাশ থেকে পেছনে সরিয়ে রাখল সীতা।

লক্ষ্মী মেয়ের মত দেখাও দিকি। আমাকে না দেখিয়ে পারবে ভেবেছো?

চেয়ার ছেড়ে ওর পাশে বিছানায় সরে এলো সুরজিত। দু'হাত দিয়ে বইটাকে ঠেলে পেছনে বিছানার শেষপ্রান্তে সরিয়ে রেখেছিল সীতা। দু'হাতে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বইটা কেড়ে নিতে গেল সুরজিত।

সুরজিত সীতার এতো কাছে কখনো আসেনি। সীতার বুকের জমানো পাহাড়ে ওর শক্ত বুকের দুঃসহ আলিঙ্গন পড়েছে। যে স্বাদ, যে গন্ধ, যে স্পর্শ যে কোনো মেয়ের সারা জীবনের দুর্লভ কামনা। ওর উষ্ণ নিশ্বাসের শিহরিত পরশ সীতার মুখের ওপর, ঠোঁটের ভিজে ভিজে কোলে। এমনি একান্তে সুরজিতকে কাছে পাওয়ার সাধ অনেকদিনের সীতার। অনেকদিনের স্বপ্ন। তাই ভুলে গেল সব। ভুলে গেল নিজেকে। ভুলে গেল সুরজিত ওর আদরের বোন গীতার স্বামী। ভালবাসায় ভরা বুক পাথর করেও এ লোভ সম্বরণ করতে পারল না তপস্বিনী সীতা। বেপরোয়া মেয়ের মতই ভরিয়ে দিল সুরজিতের সারাটা মুখ, ভিজিয়ে দিল ঠোঁট, কপাল, দুটো উদ্দীপ্ত চোখ আর রক্তাক্ত গাল অবিশ্রান্ত চুমুতে। চীৎকার ক'রে উঠল, আজতো বল, আমি ভালো, আমি কালো নই।

আজ তো বল। সত্যি না হ'ক, মিথ্যে করেই না হয় বল লক্ষ্মীটি, আমি ভালো—ভালো।

কোনো জবাব নেই সুরজিতের। বোবা। যেন এক পাথরের মানুষই জড়িয়ে রয়েছে ওকে। পাথরই হয়ে গেছে কি সুরজিত?

কিন্তু লোভের এই ভাঙা বেড়ায় দাঁড়িয়ে পাথর কেমন ক'রে হবে সীতা, কেমন ক'রে হবে। কবে কোন তপস্বিনী পেরেছে, কোন মহীয়সী নারী পেয়েছে, তার হিসেব চায় না সীতা, চায় না। পারবে না ও, যেই পারুক, পারবে না ও।

আমি কালো, তাই কি তোমার ভয়, তাই কি এতো ঘেন্না? বল না। পাথরের মূর্তিকে জোরে নাড়া দিল সীতা। ফর্সা রং ছাড়া আর সব আছে আমার। এই তো এতো। এই তো দেখো। যা তোমরা ছেলেরা চাও। যা ইচ্ছে নাও, যা খুশী কর। কিচ্ছু বলব না। দোহাই তোমার সুরজিত, ভালবাসার একটা চুমু শুধু আদরে দাও, লক্ষ্মীটি, আর কিছু চাই না—আর কিচ্ছু না।

পাথর গলল কিনা জানে না সীতা, নড়ে উঠল। তুলে ধরল কালো মেয়ের জলভরা চোখ দুটো, ভিজে ভিজে কাঁপা দুটো ঠোঁট। সেখানের ভীরু চাওযায় একটু আদর দিতেই তো গেল।

আর ঠিক এই সময়েই হঠাৎ বিষাক্ত ঘুম ভাঙল ওর। সীতা ঠেলে ফেলে দিল সুরজিতকে। ছুটে সরে আসে বিছানা থেকে ঘরের এক কোণে। চেঁচিয়ে ওঠে, প্লিজ্ এ ঘর থেকে এক্ষুনি চলে যাও সুরজিত। দোহাই তোমার। দোহাই।

ওকে ঘর থেকে একরকম বার করেই দিলাম বন্যা। শেকল টেনে দিলাম দরজায। হঠাৎ কোথেকে একি হয়ে গেল কে জানে। প্রচণ্ড ঝড়ের মুহূর্তে সব তোলপাড় হয়ে গেল। দোষ কার জানি না। তবু জানি, ক্ষমা নেই অপরাধের। মুখ দেখাতে পারব না আর কোনোদিন আদরের বোন সীতাকে। সুরজিতকে তো নয়ই। সীতার সঙ্গে সুরজিতের বিয়েতে প্রতিবাদ করিনি মনের উদারতায়। ব্যর্থ চাওয়া আর ভালবাসার মহত্ত্বে নয়, করিনি এই স্বার্থে যে, সব সময় কাছে পাব সুরজিতকে, দেখতে পাব যখন খুশী। এই ধারণাই কি ক'রে যাবে সুরজিত? বিবেক কি মনের কোণে এই

অপবাদই চিরকাল জ্বালার মত লিখে রেখে যাবে ? হয়ত। তবু পৃথিবীর আর কেউ জানুক বা না জানুক, তুই তো জানিস বন্যা আমার এ সত্যি পরিচয় নয়। কান্নার কোণ থেকে তাই এই কলঙ্কের ইতিহাস তুলে ধরলাম শুধু তোকেই শোনাবার জন্যে। অন্ধকার ঘরের ভেজানো দরজার বাইরে বিষাক্ত কামনার এই কাহিনী আর কাউকে শোনাতে চাই না। তোকেই শুধু শোনালাম। কারণ, জানি, এই কালো মেয়েকে তোর মত এতো ভালো আর তো কেউ বাসেনি। এ-সংসারে তোর ভালবাসা আমার গর্বই।

ষোলো

তোর চিঠি পেলাম বন্যা। এবারের জবাব খুবই তাড়াতাড়ি দিয়েছিস। আমার মনের অবস্থা এখন যে কি নিশ্চয়ই তা' টের পেয়েছিস তুই। তাই জবাবে বসেছি চিঠি পেয়ে। তুই লিখেছিস, অন্যায় আমি করিনি কিছু। লিখেছিস, যাকে ভালো লাগে তার কাছ থেকে চাওয়ায় কখনো কোনো অবস্থাতেই পাপ নেই। জানি, তুই একথা লিখবিই। জানি, এ পৃথিবীতে অন্তত একজন আছে যে সে-রাতের দুঃসহ সেই মুহূর্তের চাওয়ার ইতিহাসকে পাপের কলঙ্ক কখনো দেবে না। তবু, ভালো তুই যতই বল, মনের উদ্ধত ঢেউকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছি না। বার বার মনে হচ্ছে, এ অন্যায়, এ অপরাধ। কালো কুচ্ছিত হয়ে যে অপরাধ করেছি, এ যেন তার চেয়ে বেশীই অপরাধ। অনুশোচনাব চাবুক দাগই ফেলে যাচ্ছে। সংযমের দুর্বার বাঁধ কে জানে কি ক'রে ভাঙলাম, ভালবাসার কাউকে অনেক কাছে পাওয়ার লোভের সেই অসহ্য মুহূর্তে।

সেই রাতের ঘুম ভাঙল কান্নায়। আয়নায় নিজের মুখ নিজেরই দেখতে লজ্জা হ'ল। চায়ের টেবিলে রোজকার মত সকলেই এলো। বাবা, দাদা, গীতা, সুরজিত সকলেই। প্রতিদিনের মতো সকলেই সহজ হয়ে কথা বলল। সহজ হয়েই হাসল। সুরজিতও। আমিই শুধু এক কোণে কুঁকড়ে বসে রইলাম। কারো সঙ্গে ভালো ক'রে কথা বলতে পারলাম না। কারো মুখের দিকেই সহজ চোখে তাকাতে পারলাম না। সুরজিতের চোখের দিকে তো নয়ই। অনুশোচনার আগুনে ঝলসানো পাপের এ পোড়া মুখ ওকে দেখাতে লজ্জাই করতে লাগলো।

তুই লিখেছিস বন্যা, এ অন্যায় নয়। লিখেছিস, পাপ নয়। জানি। বুকের জমানো সোনাতে যদি কামনার আবেগ আসে, জমাতে দিল যে, দোষ তো তারই। যৌবনের জোয়ারে যদি

কখনো আলিঙ্গনের মুহূর্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে আসে, যৌবন যে দিল, দোষ তারই। জানি। তবু মনকে মানাতে পারি না রে। খালি মনে হয়, মিথ্যে সব। মনে হয়, সব ভুল। লজ্জার মুখ কান্নার অন্ধকার কোণে লুকোতেই চাই আমি। মনে হয়, রাতদিন এতো কাছে ওরা দু'জন যদি থাকে, এ-মুখ লুকোবার কোনো নির্জন কোণই আমি খুঁজে পাব না। আমার মনের জ্বালা কেউ বুঝবে না।

তবু ভগবান আছে। জীবনে এই প্রথম মনে হ'ল ভগবানের অস্তিত্ব। হঠাৎ খবর এলো ওদের দিল্লী বদলীর।

গীতাই খবর শোনাতে এলো আমায়, মেজদি, দিল্লী অনেক দূর না?

সে তো নিশ্চয়ই। হঠাৎ এ কথা কেন?

ও বিছানায় আমার পাশে বসে বলে উঠল, অব্ তো দিল্লা দূর নহি।

তার মানে?

তার মানে, ভেরি ইজি। ওর দিল্লী বদলী।

সে কি। হঠাৎ যে?

হঠাৎই হ'ল। নট টু কোয়েশ্চেন হোয়াই।

তুই বিয়ে করে বোম্বাই গেলি বন্যা। গীতা যাচ্ছে দিল্লী। আমিই একলা পড়ে রইলাম। দিল্লী অনেক দূরেই বটে। তোকে ছাড়তে কষ্ট হয়েছিল। কষ্ট হচ্ছে গীতাকে ছাড়তেও। তবু মনে হ'ল, এই হয়ত ভালো হয়েছে। ওদের আমি আর পারছি না সহ্য করতে। আমার কাছ থেকে ওদের দূরে যাওয়াই ভালো। অনেক দূর। ওরা না গেলে পাপের এ পোড়া মুখ নিয়ে আমাকেই পালাতে হ'ত হয়ত অন্য কোথাও। ওদের কাছ থেকে অনেক দূরে।

মা বলল, দিল্লী, বাপ্ রে সে কি এখানে নাকি।

গীতা বলল, যেতে যদিই হয় বাইরে, অনেক দূরে যাওয়াই ভালো। না মেজদি?

হ্যাঁ।

কিন্তু অত দূর গেলে আমরা দেখব কি করে ?

মা দুর্গার মত বছরে তিন দিন ক'রে বাপের বাড়ী আসবে। কুণাল জবাব দিল।

একটা দুটো ক'রে যাবার দিন এসে গেল।

গীতা দাঁড়াল এসে। চললাম মেজদি।

ওর সুন্দর নীল দুটো চোখ ছলছল করছে, দেখল সীতা। বলল, আয়।

তুইও চলনা মেজদি আমাদের সঙ্গে। বেশ মজা হবে তাহ'লে।

দুর, তা হয় না।

কেন হয় না ?

কেন হয় না, সে জবাব কোনোদিনই জানবে না গীতা। যে-জানা ওকে শুধু দুঃখই দেবে, হয়ত দেবে মেজদির ওপর অশ্রদ্ধা, সে-জানা অজানা থাকাই তো ভালো। জবাব দিল না সীতা। ওর গালে আর কপালে অনেকদিনের পর আদরে হাত বুলিয়ে দিল সীতা।

আমার কোনো কথাই কোনোদিন তুই রাখিস না মেজদি।

রাগ করিসনে বোন। এখন নয়, কথা দিচ্ছি, যাব একদিন তোর ঘর দেখতে।

কথা দিলাম ওকে। তবু জানি, হয়ত কোনোদিনই রাখতে পারব না সে-কথা। তবু জানিস তো তুই বন্যা, কোনো মেয়ের ভালবাসায় বাঁধা ঘর দেখতে আমার লোভ চিরকালের। সেই লোভেতেই হয়ত ভরসা পেলো গীতা।

যাবার আগে সুরজিতও ঘরে ঢুকল। একলা ঘরে। পায়ের সাড়া পেল সীতা। বই পড়ছিল, বই পড়তেই লাগল। একবার শুধু একটুখানি মুখ তুলল বইয়ের পাতা থেকে।

চললাম। সুরজিত বলল।

জানি। বই থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিল সীতা।

ঘরে কিছুক্ষণ দাঁড়াল সুরজিত। ইতস্তত করল একটু।—আর কিছু বলার নেই ?

পৃথিবীতে কালো মেয়ের বলার কথা তো অন্তহীন। কিন্তু শোনে ক'জন ?

কাছে এগিয়ে এলো সুরজিত। কালো মেয়ের অন্তহীন কথা শুনতেই হয়ত। হাত দুটো ধরল। সরিয়ে দিল কপাল থেকে চুলগুলোকে। হাতের ছোঁয়ায় আশ্চর্য আদর। বলল, কালো হয়েও এতো ভালো হ'লে কি ক'রে ? এতো ভালো হলে কেন ?

আর কোনো কথা বলতে পারলাম না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। সে রাতের সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে সব কিছু যখন অসহায়ের মত খোলা পড়ে ছিল, কিছুই করেনি। যা ইচ্ছে করতে পারত সুরজিত, যা খুশী। কুমারী জীবনের সবচেয়ে বড় কলঙ্কের বোঝাও সহজে ভরিয়ে দিতে পারত। কিন্তু কিছুই ও করেনি। করতে চায়নি, কি করতে পারেনি, জানি না। যেটাই হ'ক, তার জন্যে কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না আমার সুরজিতের কাছে। আজ যাবার আগের একটা কথাতে সে রাতের সব কৃতজ্ঞতা মুছে দিল সুরজিত। ওর কাছ থেকে এমনি আদরের লোভ আমার চিরকালের। অনেক কামনার। তবু যাবার আগে ওর হাতের ছোঁয়া আমার কপালে আর গালে, বিষেরই জ্বালা মনে হ'ল যেন। কালো কুচ্ছিত মেয়ের কাঙ্গাল ভালবাসাকে সুন্দর ছেলে দয়াই ক'রে গেল। যাবার আগের পরশগুলো আদরের আর ভালবাসার দাবী নয়, দয়ার অনিচ্ছার দান। ভালো বলে গেল সুরজিত। ওর মুখে নিজেকে ভালো শোনবার সাধ আমার বহু দিনের। এই পাগলামির সেই রাতেও তো কাঙ্গালপনা করেছি। তবু মনে হ'ল, এ বলা ওর নিজের খুশীতে নয়, আমাকে খুশী করবারই জন্যে। চাই না, সুন্দরদের দয়া চাইনারে বন্ধ্যা। ওদের দেওয়া কান্নাই চাই।

বিয়ের পরে একদিন প্রশ্ন করেছিল সুরজিত, মনে আছে। প্রশ্ন করেছিল, ছোটো তো জানি, কিন্তু বড় হ'তে কখনো কি ইচ্ছে করে না ? জবাব সেদিন দিতে পারিনি। জবাব সেদিন ছিল না। আজ মনে হচ্ছে, তোদের সবার কাছে আমি ছোটই হয়ে গেলাম।

সতেরো

প্রথমে গেল বন্যা, তারপর গীতা। তারপর নীতাও একদিন হয়ত এমনি চলে যাবে। পড়ে থাকবে একলা এখানে সেই শুধু। মনে হয় সীতার, অপরাধ হয়ত তারই। তাই এক এক ক'রে সবাই চলে যাচ্ছে। ভালো যারা, আদরের যারা। এক এক সময় ভাবে সীতা, কি অপরাধ তার? কালো মেয়ে হয়ে আলোর দিকে হাত বাড়িয়েছিল, তাই কি অপরাধ? কালো কুৎসিত হয়ে মাথা নিচু ক'রে, কান্নার অন্ধকার কোণে মাথা নিচু ক'রে বাঁচতে সে চায়নি, মাথা উঁচু ক'রে সুন্দর ফর্সা রঙের মেয়েদের সম পর্যায়ের গৌরবে বাঁচতে চেয়েছে। তাই কি অপরাধ? তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, এ যদি অপরাধ হয়, তবে সে এক ফোঁটাও অপরাধ করেনি। কিন্তু এ শক্ত মন কতক্ষণই বা থাকে!

কুণাল ডাকল, মেজদি।

কি রে?

তুই আজকাল খুব একলা পড়ে গেছিস না?

মৃদু হাসল সীতা। বলল, হ্যাঁ রে।

তা হ'লে চল, লিবার্টিতে খুব ভালো একটা ইংরিজি ছবি এসেছে। হিচ্‌ককের ছবি। ভালো না হয়ে কি যায়।

ব্যাপারটা কি?

হিচ্‌ককেরও নাম শুনিসনি? মিষ্ট্রী ছবি তুলতে হলিউডে ওর জুড়ি নেই, তা জানিস?

কিন্তু রাতদিন তোর খালি খেলা আর সিনেমা। বই নিয়ে তো কক্ষনো দেখি না বসতে।

আর বছরে তোর ম্যাট্রিক পরীক্ষা, তাই না?

সে এখনো অনেক দেরী। ওয়ান এণ্ড হাফ ইয়ার। পাশ করে যাব।

ঠিক তো?

সেণ্ট পারসেণ্ট ঠিক। এখন তো চল তাড়াতাড়ি।

বৌদি ঘরে ঢুকল, ভাইবোনে কি বৈঠক হচ্ছে শুনি?

সিনেমা, বৌদি। যাবে?

হ্যাঁ হ্যাঁ চলনা। তাহ'লে আরো মজা হয়। কুণালও বলে উঠল।

ও বাবা। কিন্তু কত কাজ রয়েছে যে।

ও তো রোজই আছে। বললে কুণাল।

কি ছবি গো?

ইংরিজী।

ও বাবা, বুঝবো তো? সায়েবরা যা খটমট ইংরিজি বলে।

বুঝবে না মানে? চলো তো। তারপর দেখে এসে বলো।

কিন্তু!

কিন্তু-টিন্তু শুনছি না।

সীতা ধমকে উঠল, ভারি ফাজিল হয়েছিস কুণাল।

আঠারো

চিঠি এসেছে গীতার, দিল্লী থেকে। ওখানে একা একা একটুও ভালো লাগছে না ওর। এখানে একা একা সীতারই ভালো লাগছে কি? তবুও তো ওর সঙ্গে রয়েছে সুরজিত। দোষ যাই কিছু ওর থাক, ভালো ও বাসতে পারে, ভালো ও বাসতে জানে। গীতা লিখেছে, আসবি বলেছিলি, কবে আসছিস মেজদি? যাওয়া তো এক্ষুনিই যায়, কিন্তু চলার পা দুটো যে কলঙ্কে ভরে গেছে। যে ঘর নিজে ও বাঁধতে পারত, তা শুধু দূর থেকেই দেখতে পারবে, এ ভাগ্যের মমতাহীন পরিহাস ছাড়া আর কি? এতদিন কাছে থাকা আপনার লোকজনকে ছেড়ে যাওয়ার কষ্ট, এ বেশীদিনের নয়। এ কষ্ট সুরজিত ভুলিয়ে দিতে পারবে ভালবাসায়। ওর ওপর এ বিশ্বাস আছে সীতার। তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, যাবার আগে সুরজিতের সেই দুঃসহ ছোঁয়াতে দয়ার জ্বালাই শুধু ছিল না, অনুরাগের পরশও হয়ত কিছু ছিল। তবু ভালবাসাতে যাকে কোনোদিন কাছে পায়নি সীতা, ঘৃণাতেও কি তাকে কোনোদিন কাছে পাবে না? আশ্চর্য, সুরজিতের কথা কোথাও নেই চিঠিতে। সুরজিত কি লিখতে বারণ করেছে, না গীতাই ভুলে গেছে লিখতে? সে যাই হোক, ও ভালো নিশ্চয়ই আছে। লিখেছে,তোর জন্যে বড্ড মন কেমন করছে মেজদি ডিয়ার। আর বৌদির জন্যে। বৌদি এখনো হাসে নাকি রে? জানিস, আমি আজকাল হাসি খুব কমিয়ে দিয়েছি।

দূর, জবাব দিতে বসল সীতা, হাসি কমাবি কেন? হাসতে যারা জানে তারাই তো সত্যিকারের বাঁচতে জানে। হাসতে যেদিন ভুলে যাবি, সেদিন তো তুই মরেই যাবি গীতা। যাব তোর কাছে, কয়েকদিন সবুর কর। অতো মন কেমন করলে কি চলে? মেয়ে হয়ে জন্মেছিস যখন, মনকে শক্ত করতেই হবে।

তারপর হঠাৎ একদিন সকালে ফটকের সামনে একটা রিক্সা এসে দাঁড়ালো। ছোট্ট একটা চামড়ার স্যুটকেশ আর বেডিং। অবাক সবাই, কে এলো? অবাক হলো লোকটাকে নামতে দেখেও। ইন্দ্রজিত।

এক লাফে রিক্সা থেকে নেমে, উচ্ছল হাসির সঙ্গে সিঁড়িগুলোর বুকে ছড়িয়ে দিলো প্রাণের দুরন্ত বন্যা।

চলে এলাম। মা বাবার পায়ের ধুলো নিয়ে হেসে দাঁড়াল ইন্দ্রজিত।

হঠাৎ? দাদা জিগ্যেস করল।

হঠাৎ-ই তো ভালো। তোমরা সবাই ডাকলে যখন, তখন ইচ্ছে থাকলেও আসতে পারলাম না। তাই এখন সুযোগ পেয়ে ভাবলাম একবার হঠাৎ গিয়েই সবাইকে ডাক দেওয়া যাক। হঠাৎ কখন সন্ধ্যাবেলায়, মান হারা ফুল গন্ধ এলায়।

কুণাল বলল, তোমার সবই বিদঘুটে কাণ্ড ইন্দ্রদা। আসল সময়েই এলে না।

আসল সময়ে এলে নকলের ভিড়ই বেশী হয়, তা জানিস বোকা ছেলে? আরে তুই দেখি বেশ বডসড হয়ে উঠেছিস? একেবারে ইয়ং ম্যান। ওর পিঠ চাপড়ালো ইন্দ্রজিত।

ইন্দ্রদা আসতে না আসতেই ঝিমিয়ে পড়া বাড়ীটা মুহূর্তে প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরে উঠল। সবাই ছুটেছিল ইন্দ্রদাকে দেখতে। আমি যাইনি। বই পড়ছিলাম, তবু একটুও মন ছিল না বইয়ের পাতায়। মন ছিল ইন্দ্রদার কথাতেই। জানতাম হাতমুখ ধুয়ে খোঁজ নিতে আসবেই ইন্দ্রদা। আর এলোও ঠিক তাই।

কই, হোয়ার ইজ্ আওয়ার কৃষ্ণকলি? ঘরে ঢুকল ইন্দ্রজিত। এই তো। কি গো, কি খবর তোমার?

হাসল সীতা, ভালই।

মনে তো হচ্ছে না।

হাসি দেখেও না?

হাসি তো ঠিকই। কিন্তু ওতে খুশী কোথায়?

কালো হরিণ চোখেও নেই?

ওখানে তো ভিজে ভিজে কি যেন দেখছি। তাই তো ভয় হচ্ছে।

একটু থেমে, একটু চুপ করে বলল সীতা, তুমি তো ওই কেবল' ছাখো ইন্দ্রদা।

আর কি করব বল? হাসল সীতা, ইচ্ছে করেই হাসল। কি কবতে হবে তাও কি শেখাতে হবে?

শেখবাব আর তো কিছুই নেই কৃষ্ণকলি।

হঠাৎ ঘরে ঢুকল কুণাল, খুব মওকায় তুমি এসেছো কিন্তু ইন্দ্রদা।

কেন হে?

বাবে, আজ থেকে লিবার্টিতে অড্রে হেপবার্ণের একটা নতুন ছবি শুরু হচ্ছে।

দিনরাত ওব খালি সিনেমা আর সিনেমা। ওর কথায় কান দিয়ো না তো ইন্দ্রদা।

অনেকদিন পব হঠাৎ এলো ইন্দ্রদা। ইন্দ্রদা এলো মানেই সঙ্গে এলো একগাদা খুশীর ঝড়। যেখানেই যায় ওদের সঙ্গে নিযে যায় ও। তাই তো ভালো লাগে। তাই তো মন কেমন কবে মাঝে মাঝে ওব জন্যে। সব জাযগাতেই, সকলেরই। যেখানে ইন্দ্রদা খুশীব একটুখানি দাগও এঁকে গেছে।

চা খেতে খেতে বাবা বললো, অনেক দিন পর তোমায় পেয়ে বেশ ভালই লাগছে। কোথায যে এতদিন পালিয়ে বেড়াচ্ছিলে।

ছেলেরা সাধারণত পালিযে বেড়ায় বিয়ের ভযে। আমি পালিয়ে বেড়িয়েছি ভালবাসাব ভয়ে।

কাব ভালবাসা?

কার আবার, আপনাদের সকলের।

ভালবাসায় ভয় কিসের শুনি?

ভালবাসাতেই তো সবচেয়ে বেশী ভয় মেশোমশাই।

বাবা অবাক হয়। অবাক তো হবেই। ভালবাসাতেই তো সবচেয়ে বেশী ভয় মেশোমশাই—ইন্দ্রদার এই ছোট্ট কথাটা খুব ভালো লাগলো। তবু জানি, ভয় কোথাও নেই ইন্দ্রদার। তাই বললাম,

কিন্তু তুমিই তো কতদিন রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা শুনিয়েছো ইন্দ্রদা, ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।

তা ঠিক। কিন্তু ভালবাসাকে মানি বলেই তো এই ভয়, বললে ইন্দ্রদা।

তাহলে বিয়েই করে ফেলো একটা। বলে ফেললাম হঠাৎ।

মা-ও বললো, হ্যাঁ ইন্দ্র, বিয়ে এবার করে ফেলো একটা। এভাবে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে কতদিন আব বেড়াবে ?

হাসল ইন্দ্রদা, লক্ষ্মীছাড়াই তো ভালো মাসীমা।

তবে সীতাকে'ও তোমাদের লক্ষ্মীছাড়ার দলে ভর্তি করে নাও। বে-থা তো কিছু আর করল না ও।

কাকে, কৃষ্ণকলিকে ? উঁহু, লক্ষ্মীছাড়ার দলে লক্ষ্মী মেয়ে চলবে না মাসামা, অলক্ষ্মী থাকে তো দিন।

ঠিক তেমনিই আছে ইন্দ্রদা। বদলায়নি একটুও। ববং লম্বা চওড়া উদাত্ত চেহারাটা আরো দুরন্ত হয়েছে এ-ক'দিনে। গায়ের রং আরো যেন টকটকে লাল্ হয়েছে। হাসিটা হয়েছে আরো দুর্বার।

আলো জ্বেলে বই পড়ছিলাম ঘরে। ইন্দ্রদা এসে পাশে বসলো।

তোমাব খবর শোনাও কৃষ্ণকলি।

খবর আর কি ? বই মুড়ে পাশে রাখলাম।

যা কিছু বলবার আজ রাতেই বলে ফেলো। কাল চলে যাব।

কালই ? এতো তাড়াতাড়ি ?

তাড়াতাড়ি কোথায়। এতদিন তো রইলাম।

এর নাম এতদিন ?

ওই তো তোমাদের মেয়েদের দোষ। খালি ধরে রাখতে চাও।

মেয়েদের দোষ দিলে কি হবে ইন্দ্রদা ? দোষ তো তোমাদের। আচ্ছা ইন্দ্রদা, একটা কথা জিগ্যেস করবো ?

কি আবার ?

এখনও তুমি বিয়ে করলে না কেন ?

কি জানি। হয়ত সময় হল না।

বাজে বকো না। বিয়ে করতে কত সময় লাগে শুনি ?

একটু থেমে ইন্দ্রদা বললো, হয়ত তোমার জন্যেই কৃষ্ণকলি।

আমার জন্যে। অবাক হয়ে তাকালাম ইন্দ্রদার আশ্চর্য নীল চোখ দুটোর দিকে।

হ্যাঁ। ভালবেসে কাউকে তুমি পেলে না, তাই তোমার কথা ভেবে কাউকে ভালবাসতে পারলাম না।

আশ্চর্য হয়েই কথাটা শুনলাম।

অমনি মেয়ের কান্না এলো বুঝি ?

আসুক। দোহাই তোমার কান্নাকে কান্নাই বল। মিথ্যে করে আর কিছু বলতে হবে না।

মিথ্যে আবাব কোথায়, মিথ্যে কি ?

মিথ্যেই তো। আমার এই কান্নার জন্যে তুমিই তো দায়ী ইন্দ্রদা।

আমি ?

হ্যাঁ। ঠিক তাই। কি দরকাব ছিল আমাকে কৃষ্ণকলি বলবার ? কি দবকার ছিল আমার চোখে কালো হরিণের চোখ খোঁজবাব ? আমি কালো কুচ্ছিত। সবাই তাই বলে। তুমিও তাই বললেই তো পারতে।

কিন্তু এতো আর মিথ্যে নয়।

মিথ্যেই তো। মিথ্যে মিথ্যে, সব মিথ্যে।

কান্নার বাঁধ ভেঙে গেল সীতার। চীৎকার করে উঠলো, মিথ্যে মিথ্যে। তারপর হঠাৎ ইন্দ্রদাব শক্ত চওড়া বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কান্না লুকোতেই বোধ হয়। ওর কাছে ভয় তো নেই, ওর কাছে লজ্জা তো নেই সীতাব। তারপর বুক থেকে আস্তে আস্তে মুখটা টেনে তুলল ইন্দ্রদা। মুখটা নিজের মুখের সামনে তুলে ধরলো। এতো কাছে ইন্দ্রদার আশ্চর্য নীল চোখ দুটো দেখেনি কখনো সীতা। আজকে যেন দেখতে পেলো মমতার শিশিরের ফোঁটা চিকচিক করছে ওখানে। চোখের নিচে জমা জলের ফোঁটা হাত দিয়ে আদরে মুছে দিল ইন্দ্রদা। কপালে উড়ে-পড়া চুলগুলোকে হাত দিয়ে আদরে সরিয়ে দিল। এমন আদর খুব কমই পেয়েছে সীতা।

পরের দিন সকালেই গাড়ী ইন্দ্রদার। ভোর বেলা ঘুম ভাঙার পরেই বিদায় নিতে এলো। চললাম কৃষ্ণকলি।

আবার কবে আসছ ইন্দ্রদা ?

কবে আর কি, এলেই হ'ল।

বল তো মুখে খুব, আসনা তো। এখান থেকে বদলী হয়ে গেলে আড়াই বছর প্রায় হ'ল, এতদিনে তোমার আসবার সময় হ'ল ?

আড়াই নয়, তিন। কম্নিও না।

তাই। হাসলাম। তিন বছরে একবারও আসবার সময় করে উঠতে পারলে না। কত ফাংশন গেল বাড়ীতে। তবুও তো তুমি একলা মানুষ, বে-থা করোনি, সংসারের ঝামেলা নেই।

জবাব দিল না ইন্দ্রদা। হাসতে লাগলো।

কি, জবাব দাও ? আর জবাব দেবেই বা কি। বলবে অফিসের ছুটি পাওনি। অফিস যেন আর কেউ করে না, না ?

এবার খুব তাড়াতাড়ি আসব কৃষ্ণকলি। কথা দিচ্ছি।

এবার আসবার আগে চিঠি দিও। হুট করে এসে পড়ো না।

ও কে, অল রাইট।

ঠিক মনে থাকে যেন।

ইয়েস্ ম্যাডাম।

আর শোনো ইন্দ্রদা, একটা অনুরোধ রাখবে কি ?

বল।

এবার একটা বিয়ে কর। এভাবে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে ঘুরবে আর কদিন ?

লক্ষ্মীছাড়া না হ'লে তোমাদের মত লক্ষ্মী মেয়েদের ভালাবাসা পাব কি ক'রে ?

ম্লান হেসে বললাম, ছাই ভালবাসা আমাদের।

কি জানো কৃষ্ণকলি, ভাল কথা বলতে পারি, কিন্তু ভালবাসতে পারি না ; ভালবাসার গল্পই শুধু শোনাতে পারি, ভালবাসতে পারি না। আমার মত ছেলেদের ওই তো দোষ। ঘর বাঁধার গল্প শুনতে চাও, অনেক শুনিয়ে যাব, কিন্তু সত্যিকারের ঘর বাঁধতে বল, ভেঙেই ফেলব হয়ত। আচ্ছা, চলি।

শোনো।

দাঁড়াল ইন্দ্রদা। নিচু হয়ে মাথা ঠেকালাম পা দুটোতে।

কি ব্যাপার, হঠাৎ লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে উঠলে যে?

লক্ষ্মী তো আমি চিরকালই ইন্দ্রদা। তারপর বললাম, কালো মেয়ে হয়ে, কুচ্ছিত হয়ে ফর্সা আর সুন্দরদের সঙ্গে সমান তালে মাথা উঁচু ক'রে চলবার চেষ্টা করছি, স্পর্দ্ধা আমার কম নয়। কিন্তু যতই মাথা উঁচু করে চলি, মাথা কোথাও না কোথাও নিচু তো করতে হবেই ইন্দ্রদা।

মনে হ'ল ইন্দ্রদা কিছু যেন বলতে গেল। বলল না। আশীর্বাদ করল কি না কে জানে। হয়ত কিছুই নয়। তবু যেন দেখলাম, কি যেন চিকচিক করছে ইন্দ্রদার আশ্চর্য নীল দুটো চোখের কোলে। যা আগে কখনো দেখিনি।

উনিশ

বন্যা, এ চিঠি যখন তুই পাবি, জানি ওপরের ঠিকানা দেখে খুবই অবাক হবি তুই। নাগপুব ছেড়ে বিহারের এদিকে বেড়াতে আসিনি, চাকরি নিয়েই এসেছি। সবাই তোরা এক এক ক'রে আমায় ছাড়লি, নাগপুরে কদ্দিন আর একলা আমার দিন কাটে বল? তাই স্কুল মাষ্টারি নিয়ে চলে এসেছি এখানে। বাড়ী ছাড়া বাইরের কেউ জানে না। জানাতে আমিই বারণ করেছি। তোর ছু' ছুটো চিঠি রিডাইরেক্টেড্ হয়ে আমার কাছে এসেছে, তখন বুঝছি ওরা আমার কথা রেখেছে। আর বাড়ীরই কেউ জানতো নাকি? কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে কাউকে না জানিয়েই এ্যাপ্লাই করেছিলাম। তখন কি জানতাম পেয়ে যাব চাকরিটা। হোক এখান থেকে অনেক দূর। আমার কাছে এখন দূরই ভালো। শুধু অনেক দূরই নয়, বনজঙ্গলে ভর্তি। মা বলল, সেখানে গিয়ে তোর কাজ নেই।

হাসলাম মা-র কথায়। বনজঙ্গল আবার কোথায়? দেখছ না সেখানে স্কুল রয়েছে।

তাতে কি। বাঘ-ভাল্লুকের পেটে যেতে কতক্ষণ? তোর বাপু গিয়ে কাজ নেই সেখানে।

মা যেন কি! বাঘ-ভাল্লুকের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই যে আমি কবে আসব, তার আশায় বসে রয়েছে।

চুপ কর দিকি হতভাগা মেয়ে। মুখে তোর আটকায় না কিছু আজকাল। মা ধমকে উঠল। জানিনে বাপু, যা ইচ্ছে কর। আমি আর সংসারের কোনো ব্যাপারেই নেই।

মা আজকাল সব সময়েই আমার ওপর রাগারাগি করে। বিয়ে করিনি বলে অনেকদিন থেকেই চটে আছে আমার ওপর। তবু জানি সব বোনেদের চেয়ে সবচেয়ে বেশী আমাকেই ভালোবাসে মা। ভালো না বাসলে রাতদিন এতো বকতে পারে কেউ?

কতদিন মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেছে অদ্ভুত এক আদরের ছোঁয়ায়। দেখেছি, বিছানায় মাথার কাছে বসে মা আমার কপালে চুপিচুপি হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মা জানে, আমি টের পাইনি। কিছু জানি না আমি। অতো দূরে ছেড়ে দিতে মা কিছুতেই রাজী হবে না জানি। তবু তুই তো জানিস, দূরে কোথাও আমায় যেতেই যে হবে।

দাদা বললো, এখানের চাকরি ছেড়ে অতো দূরে কি দুঃখে যাবি ?

দুঃখে নয় দাদা, সুখেই যাব।

মাষ্টারিই যদি করতে চাস্, এখানে কি তা' পাওয়া যায় না ?

হয়ত যায়। বললাম। কিন্তু এখানে থাকতে আর আমাব একটুও ভাল লাগছে না।

বাবাই শুধু বললো, দূবে গিয়ে ও যদি সত্যিকারের শান্তি পায়, যাক না।

তবু যাবাব দিন খুব কষ্টই হচ্ছিল। বুকের সঙ্গে বাঁধা মায়াব এক একটা দড়ি কাটতে এমনিই বুঝি কষ্ট হয়।

কুণাল বললো, বন্যাদি গেল, মেজদি গেল, ইন্দ্রদা গেল, কাবো জন্যে এতো কষ্ট তো হযনি বে। তুই যাচ্ছিস শুনে ভীষণ মন খাবাপ লাগছে।

দুব, মন খাবাপেব কি আছে, তুই তো এখন মস্ত বড় হযে উঠেছিস।

তাতে কি ?

তাতেই তো সব। মন দিযে পডাশোনা কববি। ম্যাট্রিকে ভালোভাবে পাশ কবা চাই। তাহলে তোকে একটা পার্কার গোল্ড ক্যাপ্ দোব।

সত্যি ?

হ্যাঁ। মেজদি তোব কখনো মিথ্যে বলেছে নাকি ?

যাবাব সময় বাড়ীর সকলেব চোখেই জল দেখলাম। এর আগে কখনো বাড়ী ছেড়ে এমনি ক'রে যাবার দরকার হয়নি। সারাক্ষণ ট্রেনে তাই মনে হ'ল, কালো বলেই হয়ত বাড়ীর সকলের আমি এতো আদরের।

কুড়ি

বন্যা, এখানে এসেছি দিন দশেক হলো। আসবার পর প্রথম দু'তিন দিন বেশ খারাপই লাগছিল। খালি মনে হচ্ছিল বাড়ীর সকলের কথা। বিশেষ করে কুণাল আর বৌদির কথা। যাবার সময় বৌদিকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম, চললাম বৌদি। বৌদি শুধু বললে, এসো। ছোট্ট দুটো শব্দ। তবু ওরা সারাক্ষণ আমার যাবার রাস্তায় শাড়ী ধরে ঘরের দিকেই টানছিল যেন। এখানে এসে প্রথম দুটো দিন আবার নাগপুরে ফিরে যাবার কথাই ভাবছিলাম। তারপর মন ঠাণ্ডা হ'ল একটু একটু করে। প্রথমবার ঘর ছেড়ে এতো দূরে গেলে প্রথম-প্রথম এমনিই মনে হয়।

তবে জায়গাটা বেশ ভালো। আর স্কুলটা যেখানে, সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য আরো ভালো। কোয়ার্টার পেয়েছি হোস্টেলের কাছে। মোটামুটি ভালোই ঘর দুটো। জানালার কাছে দাঁড়ালে পাহাড় দেখা যায়। মনে হয় যেন ওরা অনেক কাছে। কিন্তু মনে হলে কি হবে, দূর অনেক। তক্ষণই উদাসী মন হারিয়ে যায় ওই পাহাড়ের মতই অনেক দূরে—হারিয়ে যায় পাহাড়ের পাথরে পাথরে, ঘন বনের কাঁটায় কাঁটায় আর অসংখ্য নাম-না-জানা বনফুলে। উদাসী মন হারিয়ে যায় দিগন্ত বিস্তৃত আকাশে, মনে হয় হাত দিয়ে বুঝি ওদের ধরা যায়। ওরা যেন ঠোঁট নিচু করেছে পাহাড়কে চুমু দিতে, পাহাড়ের ধূসর ঠোঁটের চুমু নিতে।

সামনের ঘরটা ভালো করে সাজিয়েছি বন্যা। মনের মত করেই। সামনের দেওয়ালে টাঙিয়েছি তোর আর আমার সেই এন্‌লার্জ-করা ছবিটা।

এখানে সবার আগে টিচারদের মধ্যে ভাব হ'ল সুলেখার সঙ্গে। বেশ মেয়েটি। আমার বয়েসই হবে। বেশ ছিমছিমে দেখতে। বিয়ে করেনি। খুব কথা বলে আর হাসে। অনেকটা তোরই মত। তা বলে রঙে আর রূপে তোর কাছে লাগে না।

সুলেখা এরই মধ্যে আমার কোয়ার্টারে বারকয়েক এসেছে। ওই ফটোটা দেখে প্রথম দিনই জিগ্যেস করেছিল, তোমার সঙ্গে ও কে ভাই? বোন বুঝি?

হেসে বললাম, না। বোনের চেয়েও বড়, বন্ধু।

তোর মেয়ে হয়েছে শুনে খুব খুশী হয়েছি। ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে ওকে। কেমন হয়েছে দেখতে? বাপের মত না মায়ের মত? যার মতই হ'ক, দেখতে নিশ্চয়ই লাভ্‌লি হয়েছে। ফটো পাঠাসনি কেন?

সীতা, তোর চিঠি পেয়ে খুব রাগ হ'ল। তুই কত দূরে পালিয়ে গেছিস আর আমাকে একবারও জানানো হয়নি? দেখা হোক একবার, দেখাচ্ছি মজা। তবু জানি, চিঠিতে যতই বকাবকি করি, তোর সামনে দাঁড়ালে তোকে বুকে না জড়িয়ে কিছুতেই পারব না।

নাগপুর ছেড়ে অনেক দূরে গেছিস, কি জানি ভালো করেছিস কিনা। তুই বড় হয়েছিস, সব কিছু বুঝতেও শিখেছিস। তোকে আর নতুন ক'রে বোঝাবো কি? দূরে গিয়ে ভালো যদি থাকিস, তবেই ভালো। তোর মত নরম মনের মেয়েদেব নিয়েই তো যত ভয়। যে যা চায়, তাই দিস। যে যা দেয, তাই তোবা নিস। বেশী চাস শুধু মুখেতেই, জোর ক'বে দাবী কবতে পারিস না। এ তোদের দুর্বলতা। এ তোদের হারই।

মাষ্টারি কেমন লাগছে, তা তো লিখিসনি। আমাব বাচ্চাটাব একটা ফটো পাঠালাম এই সঙ্গে। বলিস তো দেখে, বাপ না মা কার মত মুখ হয়েছে। ভাল কথা, ওব নাম একটা ভালো লিখে পাঠাস তো। নাম ঠিক করতে হিম্‌সিম্ খাচ্ছি। ওর তোব ওপর খুব ভক্তি। বলল, সীতাকে লিখে দাও না। ভালো কোনো নাম ও ঠিক করে দিতে পারবে।

বন্যা, সত্যি বেশ দেখতে হয়েছে তোর মেয়েটাকে। ঠিক তোর মত মুখ হয়েছে। নাম রাখতে বলেছিস ভালো দেখে একটা। তোর মেয়ের নাম রাখতে আমার ভয় হচ্ছে। ও আমার দেওয়া

নাম নিয়ে বড় হলে সারা জীবন আমার মত দুঃখ পাবে হয়ত। নাম যা হয় একটা নিজেই খুঁজে নিস না।

কেমন লাগছে লিখেছিস মাষ্টারি ? বেশ ভালই তো। একগাদা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ের মধ্যে আশ্চর্য ভালো লাগে। সব ভুলে যাই। ভুলে যাই পৃথিবীর মানুষের অন্তহীন বিদ্বেষ আর ঘৃণা। ভালো লাগে ছোটো ছোটো ওদের হাসি-কান্নার মধ্যে নির্ভাবনায় হারিয়ে যেতে। ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো হাসিতে মুক্তোর ঝিকিমিকি ভরিয়ে ওরা এখানে মাটির পৃথিবীতে আশ্চর্য এক অনাবিল স্বর্গ গড়ে তুলেছে। ওখানে চেহারার দাম নেই দাম নেই কালো-ফরসার। সবাই সমান।

কোয়ার্টার থেকে একটু দূরেই নদী। কয়েক পা হাঁটলেই পৌঁছোনো যায়। কিছুটা এলোমেলো উঁচুনিচু পাহাড়ী মাঠ আর খানিকটা কাঁটার ঝোঁপ পেরোলেই নদীতে পৌঁছোনো যায়। সুন্দর জায়গাটা। একরাশ বালিতে চিক্‌চিক্ করছে রূপোলি জল। রোজ বিকেলে বেড়াতে যাই নদীর ধারে। কোনোদিন কোনো টিচার সঙ্গে থাকে, কোনোদিন একলাই। বসি অনেকক্ষণ। ঠাণ্ডা জলে পা ডুবিয়ে। অন্ধকার হলে উঠতে হয়। তাই যে ক'দিন বড় চাঁদ ওঠে খুব ভালো লাগে। বসার মেয়াদ অনেকক্ষণ। তেমন কিছু জল নেই নদীতে। মাঝখানেই যা একটু বেশী, কোমর জল হবে। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা, ছোটো থেকে বড় নির্ভয়ে এপার ওপার করে। নদীর পাশে বসে বসে তাই দেখি।

নদীর ধারে জায়গাটায় একলা বসে কত কথা মনে পড়ে বন্যা। যত সব পুরোনো সুর ভিড় ক'রে আসে। পেছনে ফেলে-আসা জীবনে, অসংখ্য দিনগুলোয় কি করলাম, কি করলাম না, পেলাম কি, কি পেলাম না। মনে পড়ে এক এক করে সকলকে।

এখানকার টিচারদের মধ্যে সুলেখার সঙ্গে সবচেয়ে বেশী ভাব হয়েছে। ওর কথা তোকে আগের চিঠিতে জানিয়েছি। বিয়ে করেনি শুনে, একদিন জিগ্যেস করলাম, কেন ?

ও বলল, এমনি।

হাসলাম। বিয়ে না করা এমনি-এমনিতেই হয় না।

তুমিই তো করনি ভাই।

আমার কথা আলাদা। আমার মত কালো কুচ্ছিত মেয়েকে কে বিয়ে করবে ভাই?

কালো ছেলেরও তো অভাব নেই এ দেশে।

তা নেই। কিন্তু আশ্চর্য কি জানো, কালো ছেলেও ফর্সা মেয়ে খোঁজে। কিন্তু কোনো কালো মেয়ে কোনো সুন্দর ছেলেকে ভালবাসলেই যত দোষ।

তুমি বুঝি কাউকে কখনো ভালবেসেছিলে?

হাসলাম। ধরে যখন ফেলেছো, 'না' বলব না।

সেই নদীব ধাবে বসে বসে ওকে আমার গল্প শোনালাম। আমার সব কথা কেউ জানত না এমন ক'বে তুই ছাড়া। এখন জানল ও। কেন বললাম, কে জানে। যখন থামলাম, দেখি অনেক রাত হয়েছে। সুলেখাব দিকে তাকালাম, দেখি চাঁদেব আলোয় ওব চোখে চিকচিক্ করছে জল। জিগ্যেস করলাম, কি, কাঁদছ নাকি? তার জবাবে ও কি বলল, জানিস? বলল, কাঁদছি ঠিকই, তবে তোমাব ছোট হবার লাঞ্ছনায নয়, তোমাব বড় হবার গর্বে।

সীতা, তোর চিঠি পেলাম। তোর স্কুলেব কথা শুনে বেশ ভালো লাগলো। ওখানে ছোটো ছোটো ছেলেমেযেদের অসংখ্য চাওয়ায় তুই যদি তোব নিজের জীবনের পাওয়াব দুঃসহ গ্লানিকে ভুলে যেতে পারিস, তবে সে তো আনন্দেরই কথা। তোর চিঠিতে জায়গাটার বর্ণনা শুনে যেতে বড লোভ হচ্ছে। বিশেষ ক'রে সেই নদীটা। ইচ্ছে করছে নদীর ধারে দু'জনে গলা জড়িয়ে জলে পা ডুবিয়ে রাতের পর রাত গল্প করে জেগে কাটিয়ে দিই। কিন্তু তা হবার কি যো আছে! মেয়েটাকে ফেলে যাব কোথায? আর ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে এক রাত কেন, এক ঘণ্টা গল্প করাও মাথায় উঠবে। কি যে দুষ্টু হয়েছে মেয়েটা কি বলব। একটা মিনিটও কি শান্ত হয়ে থাকবে? এই ডাকাত মেয়েকে নিয়ে তোর ওখানে গেলে, তোর ঘরদোর কিছু কি আস্ত রাখবে

ভেবেছিস। ওর বাবা মেয়ের নাম রেখেছে মুনমুন। কেমন লাগছে তোর নামটা জানাস।

বন্যা, তোর মেয়ের নাম আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। মুনমুন, সুন্দর নাম।

জায়গাটা সত্যি সুন্দর। আসতে লোভ হচ্ছে? চলে আয় না। তুই এখানে এলে সত্যি বন্যা, কি মজাটাই না হবে। নিয়েই আয় না মেয়েটাকে সঙ্গে ক'রে। দেখি, কত বড় ডাকাত হয়েছে।

এদিকে আর এক কাণ্ড হয়েছে। নদীর ধারে একদিন এক মনে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ আলাপ হ'ল একজনের সঙ্গে। ভদ্রলোক আর্টিষ্ট। বেশ চেহারা। অনেকটা সুরজিতের মতই। ওর মতই বয়েস হবে।

রোজই আপনাকে নদীর ধারে দেখি। ভদ্রলোকই আলাপের কথা নিয়ে এগিয়ে এলো।

হ্যাঁ। রোজই তো বেড়াই আমি। সুন্দর জায়গাটা না?

সে আর বলতে।

কিন্তু কই, আপনাকে তো আগে কখনো এদিকে দেখিনি।

দেখেননি, কারণ আপনি শুধু দেখেন। আমি আপনাকে অনেকবারই দেখেছি, কারণ আমি দেখি না, খুঁজি।

আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করলাম, কি খোঁজেন?

যেখানে যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর। ভালোকে তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে রাখাই তো ব্রত আমাদেব।

কিন্তু আমি তো সুন্দর নই?

আমার শিল্পীর চোখে আপনার মত এতো লাভলি ফিগার খুব কমই দেখেছি।

অবাক হলাম। বলে কি লোকটা। পরিচয়ের একেবারে গোড়ার দিকে এ-ধরনের কথা তো কোনো ছেলের মুখেই শোনেনি এ দুটো কান। বললাম, আমি তো কালো।

আপনি ওয়াণ্ডারফুল কালো, অদ্ভুত কালো।

অবাকের আমার শেষ নেই বন্যা। বলে কি শিল্পী। ও কি অন্ধ, না পাগল? না মিথ্যে স্তুতিবাদে আমাকে ভোলাতে চায়?

সে রাতে নদী থেকে কোয়ার্টারে ফিরে সারারাত এই শিল্পীর কথাই ভাবলাম শুধু। ভাবতে চাইনি। কাউকে ভাল লাগার অনুরাগের অধ্যায় মনের কোণ থেকে কবেই তো মুছে ফেলেছি। গ্লানির অক্ষরে লেখা অনুরাগের পাতাগুলো কবেই তো জীর্ণ বিবর্ণ হয়ে খসে পড়েছে। বেশ ছিলাম। সব কিছু ভুলে ছিলাম। হারিয়ে ছিলাম। কোথা থেকে যে এল এই ছেলেটা কে জানে। মরা ভালবাসার শুকনো ডালে নতুন ক'রে অনুরাগের চুমু দিয়ে আমায় জ্বালাতে কুঁড়ির কাঁটায়।

ঠিক করলাম, কথা বলব না। দেখা হলে সরে যাব। কথা বললে এড়িয়ে যাব। কিন্তু পারলাম কই। দোষ আমার নরম-অস্থির মনের। দোষ ওর আশ্চর্য সুন্দর কথার। পরের দিন দেখা হ'ল, বলল, কালো রঙকে নিয়ে এতো ভয় কেন আপনার? কালো তো মাটির রঙ, কালো তো রাতের রঙ, কালো তো মেঘের রঙ, কালো তো ভোমরার রঙ, কালো তো চোখের রঙ, কালো তো কৃষ্ণকলির রঙ। কই এদের তো কেউ কখনো খারাপ বলে না। সত্যিই তো। ওর মুখে যেন নতুন করে এসব শুনতে পেলাম। কালোর এতো ভালো বর্ণনা এর আগে তো শুনিনি। এতো ভালো ক'রে কেউ তো শোনায়নি। রোজ বিকেলে নির্জন সেই নদীর ধারে ও যেন আশ্চর্য রূপকথার মধু ফোঁটা ফোঁটা ঝরাতে লাগল। কথায় ভুলেছি অনেক। ওদের মত ছেলেদের কথায় বিশ্বাস নেই। ওরা শুধু কথাই শোনায়, কথাতেই ভোলায়। তাই কথা শুনতে শুনতে ওর দিকে তাকালাম। চোখের কালো তারায় কোথাও অবিশ্বাসের কালো ছায়া নেই, প্রশান্তিরই স্নিগ্ধ মেঘ। রোজ বিকেলে নদীর ধারে ওর পাশে বসে ওর কথা শুনতে শুনতে নিজেকে আবার যেন নতুন করে চিনলাম, নতুন করে দেখলাম।

একদিন ও অবাক করল আমায়, আমার আঁকা ওর একটা ছবি দেখিয়ে। বলল, দেখো তো, কেমন তুমি?

আশ্চর্য অবাক হয়েই দেখলাম।

কেমন হয়েছে, বললে না তো?

বললাম, খুব ভালো হয়েছে।

নিজেকে এতো ভালো এর আগে কখনো লাগেনি বন্যা। তবু ছবি দেখে না বলে পারলাম না। সত্যিই আমি এতো সুন্দর! না, তা হতে পারে না। ও ইচ্ছে ক'রে আমায় খুশী করবার জন্যেই তুলির সব যাদু আমার ছবিতে ঢেলে দিয়েছে। তবু ওর চোখে, ওর কথায় আর হাসিতে রহস্যময় কোনো যাদুকরকেই তো খুঁজে পেলাম না। যা কিছু পেলাম সাধারণ এক মানুষেরই লাবণ্য, অনুরাগ আর মমতা।

তারপর একদিন ও কি জিগ্যেস করলো জানিস? চাইল কি জানিস? জিগ্যেস করলে, এই আকাশের নিচে তোমায় নিয়ে ছোট্ট একটা ভালবাসার ঘর যদি বাঁধি, তোমার কোনো আপত্তি হবে কি?

কি বলছে ও? বিয়ে করবে আমায়? অবাক হয়ে গেলাম। বিশ্বাস করতে পারলাম না বন্যা। বিশ্বাস করতে চাইলাম না। তবু এতো সত্যি। মিথ্যে নয় বলেই হয়ত বিশ্বাস করতে পারলাম না। নির্জন এই নদীর ধারে এলোমেলো হাওয়া। দূরে ধুসর পাহাড়। আশেপাশে কাঁটার ঝোপে নাম-না-জানা বনফুল। গাছের ডালে ডালে পাখীদের কাকলি। বালির ফাঁকে ফাঁকে চিকচিক করছে জল। চাঁদের চুমুতে ঝিকিমিকি নদীর রুপোলি স্রোত। কেউ কোথাও নেই—শুধু ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে ঘুঘু পাখার বাসা। এইখানেই কুটির বাঁধব আমরা। নদীর ধারে গাছের ছায়ায় ছোট্ট হবে আমাদের ঘর। কেউ আর নয়। শুধু তুমি আর আমি। শুধু আমি আর তুমি। ঘর বাঁধবার এ লোভ সব মেয়েরই চিরকালের—শুধু আমার একলারই নয়।

উঠে দাঁড়ালাম। ও জিগ্যেস করল, কি হ'ল?

বললাম, দোহাই, আর লোভ দেখিও না লক্ষ্মীটি। দোহাই।

লোভ নয়, সত্যিই। বিশ্বাস কর।

বিশ্বাস করেছি। বিশ্বাস করেছি বলেই তো ওর পাশ থেকে, নদীর নির্জন কোণ থেকে ছুটে পালিয়ে এলাম কোয়ার্টারে। ভালবাসায় ভয় পাওয়া মন আমার, চাওয়ার অপূর্ণতায় ক্ষতবিক্ষত

মন আমার। সারা রাত ঘুম এলো না। ওর কথাই ভাবলাম শুধু। সে রাতই শুধু নয়, তার পরের দিনগুলোও। ক্লাসে পড়াতে পড়াতে বারবার আনমনা হয়েছি। স্কুলের টিচারদের সঙ্গে কথা, বলতে বলতে বারবার কথার খেই হারিয়েছি। সুলেখার সঙ্গে নদীর ধারে ঘুরতে ঘুরতে বারবার উদাস হয়েছি।

তুই তো জানিস বন্যা, বিয়ে আমি করতে পারতাম অনেক আগেই। কালো কুচ্ছিত হয়েও। কিন্তু কালো মেয়ে হয়েও কালো কাউকে ভালবাসতে পারিনি। সে দোষ আমার নয়। তবুও কালো ছেলের অভাব ছিল না পৃথিবীতে। কিন্তু আমি চেয়েছি মাথা উঁচু ক'রে স্বসম্মানে বিয়ের আসনে বসতে, ফর্সা সুন্দরী মেয়েরা যে গর্বে সেখানে বসে।

আমিও চেয়েছি তো ভালবাসার একটি ঘর। যে ঘরে কালো মেয়ে বলে কোনো অসম্মান হবে না। চেয়েছি মা হতে তোরই মত। মা হবার দুঃসহ কামনায় বুকের জমানো সুধা কত বিনিদ্র রাত অসহ্য করেছে, তার হিসেব কেউ তো রাখেনি। মা হব অবজ্ঞা আর গ্লানিতে নয়, মা হব ভালবাসার কামনায়। আশ্চর্য হয়ে ভাবি, এতদিনের চাওয়ার খোঁজখবর নিয়ে কোথা থেকে এলো ছবির এই আশ্চর্য যাদুকর? সেই কবে প্রশ্ন করেছিল ধানতুলী পার্কের বুড়ো মালি, কেঁউ হম্‌কো সাদী করোগি ছোকরি? তখন জানতাম না কিছু। তারপর কতদিনের পর আবার শুনলাম সেই চাওয়া। সেদিনের ছোট্ট মেয়ে আজ অনেক বদলে গেছে। অনেক, অনেক বড় হয়েছে। বুড়ো মালি কবেই মরে গেছে, কিন্তু ওর সেই কথাগুলো আজও কানে বাজে। সেদিন গোলাপ ফুলের লোভে জবাব দিতে দেরি হয়নি। আজ দেরিই হচ্ছে। তবু আজকের লোভ কি সেদিনের চেয়ে বড নয়?

তোর সব খবর পেলাম চিঠিতে। তোর জন্যে আমার সত্যিই দুঃখ হয়। আবার গর্বেরও শেষ নেই। তোর সীতা নাম কে রেখেছিল জানি না। মাটিরই সত্যি মেয়ে তুই। তাই সর্বংসহা বসুন্ধরার মতই সহ্য করে গেলি সব কিছু। আসতে লিখেছিস।

আসা কি সোজা রে ? বেশ ছিলাম বিয়ের আগে। যেখানে ইচ্ছে আসো-যাও যা ইচ্ছে কর। এখন তো একরাশ বন্ধন।

তোর খবর শুনে মনে হচ্ছে, এতদিনে বুঝি দুঃখের দিন শেষ হলো।

ভাই বন্যা, তোর চিঠি পেলাম। ওকে 'না' বলে দিয়েছি। জীবনে এই প্রথম কাউকে দুঃখ দিলাম। সুপবিত্রকে দুঃখ দেওয়াই আশা করি হয়ত শেষ। ওর চাওয়ায় কোনো প্রতারণা ছিল না বলেই ওকে দুঃখ দিলাম। কালো আর কুৎসিত বলে সারাজীবন যারা আমায় আঘাত ক'রে এসেছে, অবজ্ঞা আর গ্লানিতে বুকের ভালবাসার রঙ কালো করে দিয়েছে—ওর ভালবাসার প্রতিবাদ করে এতদিনের সব জ্বালারই প্রতিশোধ নিলাম। জানি ওর দোষ নেই। কালো মেয়ের মধ্যেও যে এতো ভালো খুঁজে পেয়েছে, তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অপার। তার মহানুভবতার শেষ নেই। দোষ নেই ওর। তবু পৃথিবীতে পুরুষ জাতির সব বিদ্বেষ আর ঘৃণার অপরাধের শাস্তি ওকেই দিলাম। যে শাস্তি ওরা কালো হবার অপরাধে কালো মেয়েকে দিয়েছে। কি জানি ভালো করলাম কিনা। যদি অন্যায় ক'রে থাকি, তার শাস্তি যেন ভগবানই দেন, যে ভগবান কালো মেয়ে ক'রে আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

এই তো ভালো বন্যা। ইন্দ্রদার মত হতেই চেষ্টা করছি। কত কিই তো চাইতে পারত ইন্দ্রদা এই পৃথিবীর কাছে। চাইল না। তবু সুখীই তো সে। কিছু না চেয়ে, না পেয়ে ইন্দ্রদার মতোই সুখী হতে পারব না কি ? হ্যাঁ, ভাল কথা। কুণালের চিঠি এসেছে। গরমের ছুটিতে আসছে ও এখানে বেড়াতে। ফার্স্ট ডিভিসানে পাশ করেছে ম্যাট্রিক। পার্কার গোল্ড ক্যাপ্ ওকে একটা কিনে দিতে হবে এবার।

সমাপ্ত